

হেমপ্রভা ।

শ্রীদ্ধারিকান্ত ঙ্গু কট্টক

প্রণীত ।

দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ।

কলিকাতা ।

সুচারু প্রেস ।

সংবৎ ১৯২২ ।

বিজ্ঞাপন ।

এই গ্রন্থ রচনা সমাপনান্তর যখন দ্বিতীয়বার পাঠ করি, তখন আমি এমত ভরসাধিত হইয়াছিলাম না যে, ইহা লোকসমাজে প্রকাশনোপপন্ন হইয়াছে, সুতরাং তৎকল্পে সন্নিবৃত্ত ছিলাম। পরে আমার এক বন্ধুর প্র্যুত আগ্রহ নিম্নন উৎসাহে আমি এই পুস্তকখানি বঙ্গভাষানুবাদক সমাজকে প্রদান করি। সমাজ পরীক্ষা করণানন্তর আমাকে ৫০ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক দেওয়ার স্বীকার করিয়া গ্রন্থস্বত্বও আমাকে পুনঃ প্রদান করিয়াছেন। বঙ্গভাষাবিশদত্ৰীপ্রকীর্ণকারী সমাজ আমাকে এত উৎসাহ দিয়াছেন বলিয়াই আমি ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতে সাহসী হইয়াছি। হে উদারমতি পাঠকগণ! এখন আপনারা যদি এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া কিস্কিন্মাত্র সুখানুভব করেন, তবেই আমার নিখিল পরিশ্রমের বিশেষ পুরস্কার হয়।

ত্রিহারিকানাথ গুপ্ত ।

ময়মনসিংহ ।

তাং ২৮শে আষাঢ় ।

শকাব্দঃ ১৮৮১ ।

মহামহিম মান্যবর শ্রীযুক্ত বঙ্গভাষাবাদকসমাজাধ্যক্ষ মহাশয়গণ সমীপেষু ।

যথোচিত বিনয়পূৰ্ব্বক নিবেদনমেতৎ

আপনারা দীনভাবাপন্ন বঙ্গভাষার ঐবর্জনাথে যে শারীরিক ও মানসিক শ্রম স্বীকার এবং সমাজকে কেহ কোন পুস্তক দান করিলে তাঁহাকে পারিতোষিক স্বরূপ অর্থব্যয় পর্য্যন্ত করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, ইহাতে যে বঙ্গভাষা অকালবিলম্বেই হৃষ্টপুষ্ট কলেবর ধারণ করিবেক, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র । আপনকারদিগের সেই যত্নে এবং কয়েক বঙ্গুর উৎসাহে প্রদানে আমি এই “হেমপ্রভা” নামে এক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছি ; কিন্তু ইহাতে কি মত কৃত-কার্য্য হইয়াছি, তাহা মহাশয়দিগের বিশেষচনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ।

এ কথা যথার্থ যে, গ্রন্থকারপদবীতে পদার্পণ করা আমার পক্ষে বামন হইয়া চন্দ্রগ্রহণ করার আশাবৎ, কিন্তু সহায়রূপ উচ্চ গিরি-শৃঙ্গের অবলম্বন পাওয়াতে, বোধ করি আমার সে আশা-নিতান্ত নিষ্ফলীকৃত হইবার নয় ; যেহেতু অত্রস্থ বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু জানকীচরণ বসু মহাশয় এতদঙ্গুরে আদ্যন্ত হুষ্টি করিয়া সংশোধন পূৰ্ব্বক ইহা লোকসমাজে প্রকাশ করিতে সাহস দিয়াছেন । সেই সাহসে এবং “গৃহ্মাতি সাধুরপরম গুণং ন দোষান্ দোষান্বিতো গুণগগান্ পরিহায় দোষঃ । বালঃ স্তন্যং পিবতি দুগ্ধমস্তগ্নিহায় তাক্ষা পয়ো রুধিরমেব নকিং জলৌকাঃ ॥” এই প্রাচীন বাক্যটির প্রতি নির্ভর করিয়াই আমি এতদঙ্গুরে প্রচারবিষয়ে সাহসী হইয়াছি ।

একান্তানুগত

শ্রীদ্বারিকানাথ গুপ্ত ।

ময়মনসিংহ ।

তাং ২২শে ফাল্গুন ।

শকাব্দঃ ১৭৬৯ ।

হেমপ্রভা ।



প্রাচীনকালে জয়ন্তীনগরে জয়েশ্বর নামে এক সর্ক-
জুগধর নরবর বসতি করিতেন । তিনি বহুকাল পর্য্যন্ত
পুত্রধনে বিরহিত থাকিয়া, পরিশেষে দেবারাধনা করিয়া
এক স্নকুমার কুমার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । নরনাথ জয়েশ্বর
বহুকালান্তে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দে মগ্ন হওত
তাল্লগ পণ্ডিত এবং দীনদুঃখিগণকে বহু ধন বিতরণ করি-
লেন । ষষ্ঠ মাসে শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে পুত্রের অন্নারস্ত
করিয়া জয়দত্ত নাম রাখিলেন । তৎপরে যথাকালে বিদ্যা-
ভাসে প্রবর্ত্ত করাইলে, জয়দত্ত বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী
হইয়া, কালক্রমে যৌবনসীমায় উত্তীর্ণ হইলেন ।

ভূপতিনন্দন দেশভ্রমণে যাইবার অভিলাষে, মৃগয়া-
চ্ছলে জনক জননীর নিকট হইতে বিদ্যায় লইয়া, একাকী
অস্বারোহণে ভ্রমণ করিতে করিতে, এক দিবস ক্ষুৎ-
পিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া, এক উদ্যানস্থিত সরো-
বর-তীরে উপস্থিত হইলেন । তথায় বৃক্ষকঙ্কে অশ্ব বন্ধন
করিয়া সরোবরে স্নান অবগাহন করত, সন্দেশিত বিলু

ফল ভক্ষণ পূরক জলপানে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিয়া, জগজ্জীবনের মন্দ মন্দ সঞ্চালনে এক মহীকুম্বলে বসিয়া পথশ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন । এমতকালে এক সর্ষাপক্ষ্মন্দরী বণিককুমারী, সখীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া দ্বান হেতু ঐ সরসীর অপারপারের ঘাটে উপস্থিত হইলেন । জয়দত্ত, বণিককন্যার কাপলাবণ্য দেখিয়া, স্মর-দশার প্রভাবে অচেতনপ্রায় হইলেন । কিয়ৎকালান্তে চৈতন্য পাইয়া দেখিলেন, সেই লোচনামণিদায়িনী কামিনী অপারপারের শোভা দূর করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন । রাজকুমার নবানুরাগ বশতঃ সেই ননোহারিণী কন্যাতে চিত্ত সনর্পণ পূরক পদব্রজে এক বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসাদ্বারা জানিলেন, ঐ নগরের নাম হেমন্তপুর ; তথায় হেমচন্দ্র নামে প্রচুরধন-স্বামী এক বণিক বাস করেন । যাহাকে রাজকুমার বাপীতটে ঈক্ষণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার কন্যা, নাম হেমপ্রভা ।

নৃপতিনন্দন, পরিচয় প্রাপ্তে মনোরথ-নদীর সেতুর অবলম্বন পাইয়া, ধনপতি হেমচন্দ্রের আলয়ে উপস্থিত হইলেন । হেমচন্দ্র যথোচিত সম্বর্জনা পূরক জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নাম কি ? এবং কোথা হইতে আগমন করিলেন ? রাজপুত্র আনুপূর্যক পরিচয় প্রদান করিয়া বণিকতনয়ার পরিণয়ের প্রার্থী হইলে, হেমচন্দ্র মনে মনে নিতান্ত অফুর হইয়া আপন আবাসের অনতিদূরে যে যোজনবিস্তৃত এক উপবন ছিল, তথায় রাজকুমা-

রকে লইয়া গেলেন । দেখিতে পাইলেন উপবনটি নানা প্রকার বৃক্ষাদিতে অতি শোভনতম হইয়া আছে, ফল ফুল মুকুল ও নূতন পল্লবাদিতে সমুদায় পাদপকে যেন যুবদ্ধ-দশায় পরিণত করিয়াছে, তাহার শাখা প্রশাখায় বিবিধ প্রকার বিহঙ্গম বসিয়া আচ্ছাদে মোহনম্বরে গান করিতেছে, অলিকুল নখুলোভে লোলুপ হইয়া গুণগুণ শব্দে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া উড়িয়া বসিতেছে, বনমধ্যে স্থানে স্থানে নির্মলবারিপূরিত সরসীমধ্যে যুখে যুখে হংস বক চক্রবাক প্রভৃতি পক্ষিগণ কেলিকুতূহলে বিরাজ করিতেছে, বৃক্ষের পাতায় পাতায় রবির তেজ বদ্ধ হইয়া মধ্যে মধ্যে জলে স্থলে এক একটু জ্বালান্তরগত অতেজস্বী আলোক পতিত হইয়া অত্যাশ্চর্য্য অনুপম শোভা সম্পাদন করিয়াছে । ধনস্বামী হেনচন্দ্র, রাজপুত্র সমভিব্যাহারে তদ্রথ্যস্থ এক সরোবরতীরে উপস্থিত হইয়া দেখাইলেন, চৈতন্যহীন প্রস্তরময় একটি মনুষ্য বৃক্ষমূলে পড়িয়া আছে ; ক্ষণে ক্ষণে “যেমন কর্ম তেমন ফল ” এই শব্দটি তাহার মুখ হইতে প্রস্ফুটিত হইতেছে । দেখাইয়া বলিলেন, যিনি আমাকে এই মনুষ্যটির প্রস্তরাবয়ব হওয়ার এবং যে বাক্যটি ইনি বলিতেছেন, তদগম্য বলিতে পারিবেন, তাঁহাকেই আমার কন্যা সমর্পণ করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি । জয়দত্ত ক্ষণেককাল চিন্তা করিয়া, জ্যোতির্বিদ্যার প্রভাবে সমুদায় জানিতে পারিয়া বলিতে লাগিলেন, মহাশয় শ্রবণ করুন ।

পূর্বকালে ত্রিদ্বার নগরে জীবৎসল নামে এক প্রজা-

বৎসল ভূপাল ছিলেন । ক্রমে ক্রমে তিনি অতীব বিক্রম-
শালী হইয়া প্রায় অর্দ্ধ পৃথিবীর অধীশ্বর হইলেন । এক
দিবস তিনি আপন প্রধানামাত্যমুখে শুনিতে পাইলেন,
তাঁহার সৈন্যমধ্যে তাঁহার প্রহরিকার্য্যে যে সকল সেনা
আছে, তাহারা বিপক্ষের সঙ্গে মিলিয়া তাঁহার নাশের
পথ দেখিতেছে । শুনিয়া অবিশ্বাসীদিগকে যথোচিত
দণ্ড করিয়া দেশ হইতে নিষ্কাশন করিয়া দিলেন । পরে
আপন শরীর রক্ষার্থে রাজপুত্রদ্বয়কে প্রহরীর কার্য্যে
নিযুক্ত করিলেন । রাজপুত্রগণ অতি সতকর্তার সহিত
পর্য্যায়ক্রমে স্বীয় স্বীয় ভারের কৰ্ম্ম নিরূহ করিতে
লাগিলেন ।

এক দিবস রজনীর শেষভাগে ছোট রাজপুত্রের পালার
কালীন গবাক্ষদ্বার দিয়া এক ভয়ঙ্কর সর্প ফণা ধরিয়া
রাজার পল্যঙ্কাভিমুখে গমন করিতে লাগিল । রাজতনয়
দেখিয়া ভয়ে অভিভূত হইয়া ব্যস্তে সমস্তে সর্প নষ্ট
করার মানসে করে করাল তরবারি ধারণ পূর্ব্বক সর্পের
অনুগামী হইলেন । সর্প পল্যঙ্কের সমীপবর্ত্তি গবাক্ষ-
দ্বার দিয়া বহির্গমন করিল । রাজকুমার দেখিয়া প্রত্যা-
গমন করিতেছেন, ইত্যবসরে রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল ।
ভাবিলেন, পুত্র আমাকে নষ্ট করার অভিলাষে আগিতে-
ছিল, শেষে আমার নিদ্রাভঙ্গ জানিয়া লজ্জায় পলাই-
তেছে । অমনি ক্রোধপরবশে রাজসভায় আগমন পূর্ব্বক
ঘাতকগণকে আজ্ঞা করিলেন, অবিলম্বে কুলকুঠার ছোট
রাজপুত্রের মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া আন ।

গুলি হেলিয়া দুলিয়া এদিকে ওদিকে পড়িতেছে । এমনত
কালীন একটি ফল তাহার সম্মুখে পতিত হইল ।
ব্রাহ্মণী কুড়াইয়া লইয়া ভাবিতে লাগিল, এই ফলটি আর
কাহাকে দিব, যাহার সৌন্দর্য্যে আমার নয়নের প্রীতি
জন্মিবে তাহাকেই দেওয়া কর্তব্য ।

দ্বিজ-জায়ার এক প্রিয়পাত্র ছিল । ফলটি তাহার
হস্তে দিয়া বলিল নাথ ! ফলের গুণ তো জ্ঞাতই আছেন ;
এখন ভক্ষণদ্বারা এ দাসীকে ক্লতার্থম্মন্য করুন । ফলগুলি
অবনিম্পর্শ হইলে তাহাতে বিষত্ব জন্মিত । শুক এ কথা
পূর্বে বলে নাই । লম্পট ফল ভক্ষণ করিবামাত্র সর্দাজ
বিষে জর্জরীভূত হইল । অমনি হা হতোম্মি বলিয়া
ধরায় পতিত হইয়া উপপত্নী-সম্বোধনে বলিতে লাগিল
রে দুষ্চারিণি ! তুই আমাকে বিষ ভক্ষণ করাইলি ! তোর
দ্বারা যে এতাদৃশ নৃশংস ব্যবহার হইবেক আমি স্বপ্নেও
ইহা জানি না । আমি তোকে আত্ম-সমর্পণ করিয়া
দিয়াছিলাম, তাহার কি এই প্রতিফল ! বলিয়া অমনি
শমননিকেতনে গমন করিল ।

ব্রাহ্মণবনিতা চিরপ্রণয়কের হঠাৎ এতাদৃশ বিষম দশা
দেখিয়া চতুর্দিক একবারে শূন্যময় দেখিতে লাগিল ।
বাম্পাকুল লোচনে গদগদস্বরে শোকাবেগচিন্তে বলিতে
লাগিল হে বিধাতঃ ! তোমার কি এই মনে ছিল ! যা
হউক, তোমার মনে যাহা ছিল তাহাই করিয়াছ ; এখন
আমাকে নাথের অনুগামিনী কর ! আর বাঁচিবার অভি-
লাষ নাই । হা নাথ ! একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখ,
(২)

তোমার দাসীর কি দুর্গতি হইয়াছে ! ব্রাহ্মণী সমস্ত রজনী কান্দিয়া কান্দিয়া দিবসোন্মুখে নোকলজ্জা ভয়ে শবটী এক স্রোতস্বতী মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, ঘরে আসিয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিল, এ শুকের জন্যেই আমার এ প্রমাদ ঘটিল । করে কি, ব্রাহ্মণ পাছে জানে এই ভয়ে শুককেও কিছু বলিতে পারিল না । দিবানিশী কেবল শোকানলে দগ্ধ হইতে থাকিল ।

ব্রাহ্মণ শ্বেতকুশেরও একটি উপপত্নী ছিল । যুবতী দশা-বধি তাহার প্রতি তাহার এমত প্রীতি জন্মিয়াছিল যে, শ্বেতকুশ যখন যে দুর্লভ বস্তু পাইত তাহা তাহাকে দিত । একদা শ্বেতকুশ আপন আবাসের উদ্যান মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে উক্ত ফলের পাদপটী দেখিতে পাইল । সম্মুখে গিয়া দেখে, বৃক্ষটী বহুফলভরে অবনত হইয়া আছে । ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে করিতে বৃক্ষচ্যুত একটি ফল পাইয়া বহুযত্নে আপন বসনাঞ্চলে বান্ধিয়া রাখিল । ভাবিল দিবা অবসানে সুখনির্শার আগমন হইলে ফলটী পরম প্রেয়সী উপপত্নীকে ভক্ষণ করাইয়া পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করিবে ।

ক্রমে দিবাবসান হইতে লাগিল । সরোজিনী-নায়ক স্বীয় সাম্রাজ্যের রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিতে করিতে একান্ত ক্লান্ত হইয়া, বিশ্রামার্থে চরনাচল নামক পলঙ্কে উপবেশন করিলেন ; শ্রমহারিণী যামিনী প্রিয়সখী সুষুপ্তি সহ আগমন পূর্ব্বক স্বায় মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন ; জগজ্জীবন পবন তাঁহাদিগের সঙ্গী হইয়া সোঁ সোঁ

লইল। মোহিনী দেখিল কর্তা, কত্রী, স্বামী, সকলেই
প্রাণত্যাগ করিলেন; এখন আমার বাঁচিয়া থাকা কেবল
বিড়ম্বনা-ভোগমাত্র। কেইবা দয়া করিয়া আমাকে গ্রাসা-
চ্ছাদন প্রদান করিবে? কেইবা সান্ত্বনাবাক্যে আমাকে
এই শোকসিন্ধু হইতে উত্তীর্ণ করিবে? আমারও বাঁচিয়া
থাকাপেক্ষা প্রভু ও নাথের অনুগামিনী হওয়া নিতান্ত
কর্তব্য। এই বিবেচনানন্তর সেও উক্ত প্রজ্বলিত অগ্নি-
কুণ্ডে পরিনিবেশ করিল।

রাজকুমার এই অখ্যায়িকা সমাপনপূর্ব্বক অঞ্জলিবদ্ধ
হইয়া বাঙ্গা কুন্দ-লোচনে অর্দ্ধক্ষুটবাক্যে বলিতে লাগি-
লেন ধর্ম্মাবতার! অবিচারে কর্ম্ম করা উচিত নয়। চরণে
ধরি, বিনয় করি, প্রাণাধিক অন্তরের কি অপরাধ দৃষ্ট
হইয়াছে, প্রকাশ করিতে আজ্ঞা হয়। কিন্তু রাজা, এই
উপাখ্যানের প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া ঘাতক-
গণকে আজ্ঞা করিলেন, শীঘ্র শীঘ্র তোদের কর্ম্ম তোরা
সমাপন কর্।

মধ্যম রাজকুমার দেখিলেন বড় রাজকুমারের অধ্যব-
সায় নিরফল হইল, তখন অমাত্যগণ ও জনক সম্বোধনে
বলিতে লাগিলেন হে সচিবগণ! হে রাজন্! অবিচারে কর্ম্ম
করিলে পরিণামে অনেক বিপদ সম্ভাবনা। পূর্ব্বকালে
এক বণিক অবিচারে স্বীয় পুত্রবধূকে বধ করিয়া পরি-
শেষে সবংশে প্রাণাশে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। তৎপ্র-
সঙ্গ করিতেছি, শ্রবণ করুন।

ভবতীপুরে ভদ্রাবল নামে এক বণিক বাস করিতেন।

তাহার বৎসলতা নান্নী এক রমণী ছিল। ভদ্রাবল ব-
 গিণ্ড্য ব্যবসায় দ্বারা বহুধনস্বামী হইয়াছিলেন। কিন্তু
 একালমধ্যে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিতে না পারিবার সন্নদা
 নিতান্ত বিষণ্ণ থাকিতেন। এক দিবস তিনি মনে মনে
 বিবেচনা করিতে লাগিলেন, জগদীশ্বর আমাকে কুবের
 তুল্য ধনাধিপতি করিয়াছেন ; কিন্তু পুত্রধন অভাবে এ
 সকলই বৃথা জ্ঞান হইতেছে। পুত্র না জন্মিলে এ ধনে
 কি সুখ হইবে। বস্তুতঃ যে নাকি কেবল ধনস্বামী
 হইয়া পুত্রমুখ নিরীক্ষণে বিরহিত আছে ; তাহার এই
 সংসার কেবল বিষময় জ্ঞান হয়। পরিশেষে সংসার-
 ধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক নিতান্ত বিবেকী হইয়া এক বিপিনে
 প্রবেশ করিয়া, পুত্র-কামনায় দেবদেব মহাদেবের আরা-
 ধনায় তৎপর হইলেন।

দেবরাজ পার্শ্বতীনাথ, ভদ্রাবলের তপস্যায় সন্তুষ্ট
 হইয়া, স্বয়ং সম্মানসিবেশ ধারণপূর্বক হস্তে একটি ফল
 লইয়া আসিয়া বলিলেন বৎস ভদ্রাবল ! তোমার যোগ-
 বলে জগৎকর্তা পশুপতি তুচ্ছ হইয়া আমাকে এই ফল
 দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন, এবং বলিয়া দিয়াছেন এই ফল
 দ্বারা তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবেক। তুমি হৃষ্টচিত্তে
 ঘরে যাইয়া স্বীয়পত্নী বৎসলতাকে এই ফল ভক্ষণ করাও।
 ইহা কহিয়া সম্মানসী অন্তর্দ্বান হইলেন। ধনপতি ভদ্রা-
 বল আচ্ছাদিত চিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, দেবদত্ত
 বরফল বৎসলতাকে দিয়া বলিলেন প্রিয়ে ! জান তো,
 আমি পুত্রকামনায় মহাদেবের আরাধনায় সমাধি করিয়া-

হিলাম ; অদ্য উমাপতি প্রসাদস্বরূপ আমাকে এই ফল দিলেন ; বলিয়া দিয়াছেন এই ফল তুমি ভক্ষণ করিলেই, পুত্ররূপ চন্দের উদয়ে আমাদিগের চিত্ত-চকোরের পরিতৃপ্ত হইবেক ।

বৎসলতা, পুলকিতান্তঃকরণে ফল গ্রহণ করিয়া, মানান্তে ভল্লিতাবে ভগবতী কাত্যায়নীর অর্চনা সমাপন পূর্বক ফল ভক্ষণ করিলেন । অব্যবহিত পরেই বণিক-পত্নী কোতুকচ্ছলে স্বীয় স্বামী ভদ্রাবলের নিকট গর্ভের কথা ব্যক্ত করিলেন । ধনপতি, বাক্-পথাতিত আনন্দে অভিভূত হইয়া, মহাসমারোহে সীমন্তোন্নয়ন সংস্কারাদি সমাধা করিলেন । যথাকালে বৎসলতা এক সুকুমার কুমার প্রাপ্ত হইলেন । ভদ্রাবল শুনিয়া যাহার ইয়ত্তা নাই আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া, ভাণ্ডার হইতে ধন আনাইয়া অকাতরে ত্রাক্ষণ পণ্ডিতগণকে দান করিতে লাগিলেন । আগত ভূদেবগণ বণিকতনয়কে আশীর্বাদ করিলেন ; যাহার প্রসাদাৎ পঞ্চানন গরল-ভক্ষণে অট্টেতন্য হইয়া পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইয়াছেন ; যিনি মহাসুর শুম্ভ নিশুম্ভকে সংহার পূর্বক সুরগণকে অভয় করত দেবরাজ ইন্দ্রকে পুনর্বার স্বর্গের অধিপতি করিয়াছেন ; যাহার প্রসাদাৎ জানকীনাথ ত্রীরামচন্দ্র, স্বীয়পত্নী পূর্ণলক্ষ্মী সীতাকে, দূরত্ব দশাননের বংশ ধ্বংস করত উদ্ধার করিয়াছেন ; সেই ত্রিলোকেশ্বরী কৈলাসবাসিনী আপনার পুত্রকে রক্ষা করুন । দ্বিজগণ আশীর্বাদ প্রয়োগান্তে গমন করিলেন ।

বণিকতনয়, শূরপক্ষের চন্দের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি

পাইতে লাগিলেন । ষষ্ঠমাসে শুভ অম্বারন্ত হইল । নাম
 বিমলেন্দু রাখিলেন । তদনন্তর পঞ্চম বর্ষে বিদ্যাভ্যাসে
 রত করাইলেন । কালক্রমে বিমলেন্দু সকল বিদ্যায় পার-
 দর্শী হইলেন । ভদ্রাবল, পুত্র উপযুক্ত হইয়াছে জানিয়া
 পুরোহিতকে ডাকিয়া বলিলেন প্রভো ! বিমলেন্দু এখন
 যৌবনসীমায় উত্তীর্ণ হইয়াছে । আমার ইচ্ছা এই যে,
 একটি উপযুক্ত পাত্রী হইলে তাহার বিবাহ দি । পুরো-
 হিত বলিলেন প্রভাবতী নগরে প্রভাকর নামে এক বণিক
 বাস করেন । তাঁহার বিদ্যুজ্ঞতা নাম্নী পরমাসুন্দরী এক
 দুহিতা আছে ; সেটি আমাদিগের বিমলেন্দুর যোগ্য ।
 তদ্যতীত আর পাত্রী দেখি না । কল্য শুভ লগ্ন আছে ।
 আপনি এক খানি রথের আয়োজন রাখিবেন । আমি
 কল্যই প্রভাবতী নগরে যাত্রা করিয়া বিবাহের কথোপ-
 কথন নির্বদ্ধ করিয়া আসিব, বলিয়া ওদিন বিদায় হই-
 লেন । পর দিন শুভলগ্নে যাত্রা করিয়া রথযানে প্রভাবতী
 নগরে উপস্থিত হইয়া, ধনপতি প্রভাকরের সহিত সাক্ষাৎ-
 কার লাভ করিলেন । প্রভাকর, অভ্যাগত ব্রাহ্মণ দেখিতে
 পাইয়া পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা অর্চনা পূর্বক বসিতে আসন
 দিলেন । ব্রাহ্মণ, অভীষ্টসিদ্ধির্বতু বলিয়া আসন পরি-
 গ্রহ করিলেন ।

প্রভাকর জিজ্ঞাসা করিলেন দেবতে ! কোথা হইতে
 আসিতেছেন ? এবং কি অভিপ্রায়েইবা এ দীন নরাধমের
 আলয় শুদ্ধ করিলেন ? ব্রাহ্মণ বলিলেন আমার বাসস্থান
 ভবতীপুর । আমি বণিকরাজ ভদ্রাবলের পুরোহিত ।

ভদ্রাবলের একটি পুত্র আছে। শুনিয়া থাকিবেন, সে
 কপে রতিপতি, গুণে বৃহস্পতি। ভদ্রাবলের ইচ্ছা যে,
 তাহার সহিত আপনার কন্যাটির বিবাহ হয়। প্রভাকর
 শুনিয়া নিতান্ত আক্লাদিত হইলেন, এবং এই খানেই
 কন্যার বিবাহ দেওয়া কর্তব্য, মনে মনে স্থির করিয়া, স্বীয়
 পত্নীকে গিয়া বলিলেন প্রিয়ে! বিদ্যুল্লতা এখন বিবাহ-
 যোগ্য হইয়াছে। শুনিয়া থাকিবে, ভবতীপুরে ভদ্রাবল
 নামক বণিকের একটি পুত্র আছে; সে অতি ক্রীমান্ এবং
 বুদ্ধিমান্। ভদ্রাবলের পুরোহিত তাহার সম্বন্ধবাস্তা লইয়া
 আসিয়াছেন। তোমার অভিগত হইলেই সম্বন্ধ স্থির
 করিয়া, বিদ্যুল্লতাকে বিমলেন্দুসাৎ করিয়া কন্যাদায় হইতে
 মুক্ত হইতে পারি; আমার জানা আছে ঘর বর অতি
 ভাল। বণিকপত্নী বলিলেন স্বামিন্! আপনার মত হইলে
 আমার অমত কি? প্রভাকর, গৃহিণীর অভিপ্রায় জানিয়া
 আগত দ্বিজসম্মিধানে গিয়া নিবেদন করিলেন মহাশয়!
 কল্য আমার পুরোহিতকে বাগদানের দ্রব্য সামগ্রী সহ
 পাঠাইয়া দিব। আপনারা গিয়া শুভকর্মের আয়োজন
 উদ্যোগে প্রবর্ত হউন, বলিয়া প্রণাম করিলেন। দ্বিজ
 আশীর্বাদ প্রয়োগান্তে রথযানে ভবতীপুরে প্রত্যাগমন
 করিয়া, ভদ্রাবলের নিকটে গিয়া বলিলেন বাছা ভদ্রে!
 তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ হইবেক। কল্য প্রভাকর বাগদানের
 সামগ্রী সহ তাহার পুরোহিতকে পাঠাইয়া দিবেন।
 তুমিও শুভকর্মের আয়োজন উদ্যোগে প্রবর্ত হও।

তৎ পর দিন প্রভাকর আপন পুরোহিতকে যথোচিত

দ্রব্য সামগ্রী এবং বহু ধন সহ পাঠাইলেন ; বলিয়া দিলেন, যেন কোনমতে কোন বিষয়ের ত্রুটি না হয় । পুরোহিত, ভবতীপুর ভদ্রাবল বণিকের বাটী পৌছিয়া, লগ্নপত্র করিলেন । পরিশেষে শুভলগ্নে শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে প্রভাকর, দুহিতা বিদ্যুল্লতাকে পাত্রসাৎ করিয়া দিয়া দান দৃঃখী অনাথগণকে বহু ধন বিতরণ পূর্বক আপনালয়ে গিয়া, মহাসুখে কালযাপন করিতে থাকিলেন ।

ভদ্রাবল, পুত্র ও পুত্রবধুর সুখ বিধানার্থে আপনাবাসান্তরালের এক উদ্যান মধ্যে, দম্পতির বাসোপযোগী এক সুরম্য হর্ম্য প্রস্তুত করিয়া দিলেন । বিমলেন্দু বিদ্যুল্লতা উভয়ে সেখানে মহাসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন ।

সুখ গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইল । সমুদয় তরু লতা হরিদ্রণাভিষিক্ত হইয়া, মদগর্ভে বায়ুতে হেলিয়া দুলিয়া নানা প্রকার আনন্দ করিতে থাকিল ; হরিণ হরিণী, তৃণার্ভ হইয়া ইতস্ততঃ জলাশয়েষণ করিতে লাগিল ; তাহাতে আবার পূর্ণ শশধর স্বীয় সহচর নক্ষত্রগণ সঙ্গে, গগনমণ্ডলে আরোহণ পূর্বক রমণীয় কিরণ বিতরণ দ্বারা জগজ্জনের মন হরণ করিতে লাগিলেন । বিমলেন্দু, বিদ্যুল্লতাকে লইয়া অলিন্দোপরি উঠিয়া এদিকে ওদিকে বিচরণ করিতে করিতে বলিলেন প্রিয়ে ! বিরহিণীরা এখন কি দশায় আছে ? আহা ! কি সুখ নিশী ! চতুর্দিক নবীন নবীন দেখাইতেছে ! বোধ হইতেছে যেন রমণীয়

গ্রীষ্মকাল এই উপবনमध्ये আবাস বানাইয়া বিরাজ করিতেছে । দেখ ! গন্ধরাজ জাতী জ্বতী মালতী পুষ্পগুলি দন্তপাঁতি বিকসিত পূৰ্ণক সহাস্য বদনে, আপন নাথ দক্ষিণানিলের সহিত মস্তক লাড়িয়া লাড়িয়া কৌতুকমোদ করিতেছে । এইমতে গ্রীষ্ম ঋতুর অবসান হইল ।

নিদারুণ বর্ষাকালের আগমনে গগনমণ্ডল মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া মুষলধারায় বারি বর্ষণ হইতে লাগিল ; সমুদয় জলাশয় জলে পরিপূর্ণ হইল ; পদ্ম, কুমুদ সমুদয় জলপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া জলাশয়ের শোভা বৃদ্ধি করিল ; হংস, চক্রবাক, ডাঙ্ক প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গগণ নূতন জলাগমে, আনন্দে মোহিত হইয়া জলাশয় মধ্যে কেলি করিতে থাকিল ; ময়ূর ময়ূরী মেঘ দেখিয়া আছন্দে পৌঁকম ধরিয়া নৃত্য করিতে লাগিল । 'বণিকতনয়, বনিতা সন্মোদনে বলিলেন প্রেয়সি ! শুনিতোছ ? আহা ! ভেকগুলি মকো মকো শব্দে কি বিপুল আনন্দ প্রকাশ করিতেছে ! খেচরগণ আপন আপন কুলায়ে বসিয়া মধুরস্বরে কিবা অপূৰ্ণ দু একটি কথা বলিতেছে ! বৃক্ষ লতাগুলি যেন একতানমনে তাহা শুনিতোছে, এবং অঙ্গ অলস হইয়াছে ! বলিয়া দুই জনেই অনন্যমন হইয়া, কেবল তাহাই দেখিতে ও শুনিতে লাগিলেন । এইমতে নিয়মিত কালান্তে বর্ষা ঋতুর শেষ হইল ।

মনোহারিণী শরদ্ ঋতুর আগমন হইল । তখন এই অসীম আকাশে জ্যোতির্ময় পূর্ণচন্দ্র প্রকাশিত হইয়া সুধাসিক্ত আছাদকর কিরণ বর্ষণ পূৰ্ণক এই পৃথিবীকে

পরম রমণীয় অনুপম সুখধাম করিল ; সুধাংশুর অংশু
জলাশয়ের আলোড়িত জলে প্রতিভাত হইয়া বৃক্ষচ্ছায়ায়
যাইয়া দৌড়িয়া দৌড়িয়া এদিকে ওদিকে বেড়াইতে
লাগিল ; শেফালিকা প্রভৃতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া গন্ধে
চারিদিক আমোদিত করিল । বিদ্যুলতা সুখে অধীরা
হইয়া মনের আবেশে স্বীয় কান্তু বিমলেন্দুকে বলিলেন,
অয়ি নাথ ! দেখিতেছ, উৎপলগুলি আপন নাথ সুধাংশুর
সমাগমে কত আনন্দই অনুভূত করিতেছে । রজনী প্রায়
শেষ হইয়াছে ; চন্দ্রদেব আপনাবাসে গমনোন্মুখ হই-
য়াছেন । আহা ! প্রণয়ের কি এই ধর্ম ! যাহার সমাগমে
রজনী এতাদৃশ বহুল আনন্দাধিকারিণী হয়, তাহার কি
এই উচিত ! বিমলেন্দু ভার্য্যার মনোগত ভাব বুঝিতে
পারিয়া, প্রতিউত্তর প্রদান করিলেন । প্রিয়ে ! মনের
সহিত বলিতেছি ; এ দেহে জীবন থাকিতে এ সুখ নিশীর
অবশান হইয়া, বিরহ হইবেক না । কালক্রমে শরদ্-
ঋতু কাল প্রাপ্ত হইল ।

শুভক্ষণে ভীষণাস্য হেমস্তের উদয় হইল । অম্প অম্প
শিশির পড়িতে লাগিল ; ধান্য প্রভৃতি রবিধন্দ পাকিয়া
ইতস্ততঃ নয়নের বড় প্রীতি জন্মাইল ; ভগবান্ কন্দর্প,
মূল্যফুলে স্বীয় শূর বানাইলেন । বনিকদম্পতি সুখে
হেমন্তঋতুর সুখসন্তোগ করিতে লাগিলেন । মাসদ্বয়ে
হেমস্তের অন্ত হইল ।

দুরন্ত শীত ঋতুর আবির্ভাবে দিগ্বিদিক্ শিশিরে
একেবারে আচ্ছন্ন হইল ; বক, জবা, অপরাজিতা ইত্যাদি

ফুল-পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল ; মৎস্যলোভী পক্ষিগণ ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া উড়িয়া যাইয়া ঝিলে ঝিলে বসিতে লাগিল । বিমলেন্দু বনিতাসহ শীতঋতুর সুখসম্ভোগ করিতে লাগিলেন । ক্রমে ক্রমে শীতঋতুর চরমকাল উপস্থিত হইল ।

রমণীয় বসন্তকালের আগমনে সুগন্ধ গন্ধবহের সুশীতল সঞ্চালনে দশদিক আমোদিত করিয়া ফেলিল ; সমুদয় তরু, লতা, কিশলয় মুকুল মুঞ্জরিতে সুশোভিত হইয়া উঠিল ; বনপ্রিয়গণ ডালে ডালে বসিয়া কুছ কুছ স্বরে পৃথিবীস্থ তাবল্লোকের মন হরণ করিল ; অলিকুলের ঝঙ্কারে যুবক যুবতীগণের অঙ্গ মন্থথরসের উদ্বেক সহকারে সিহরিয়া উঠিল । বিমলেন্দু, বিদ্যুল্লতার হস্ত ধারণ করিয়া, নিশীষোগে পূর্ণচন্দ্রের আলোকে উপবনमध्ये ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ পূর্বক, সুখ বসন্তকালের সুখ আহরণ করিতে লাগিলেন । কিঞ্চিৎকালান্তে বণিকনন্দন নিদ্রাবেশে কাতর হইয়া উপবনস্থ অটালিকায় প্রত্যাগমনপূর্বক পল্যঙ্কোপরি শিরীষ কুসুম সদৃশ শয়্যায় শয়ন করিয়া সুস্বাপ্ত প্রাপ্ত হইলেন । বিদ্যুল্লতাও তদুপরি এক পাশ্বে শয়ন করিয়া বিহঙ্গমগণের গান শুনিতে মনঃসংযোগ করিয়া থাকিলেন । তদনন্তর রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময়ে নদীতীরে এক শৃগাল ডাকিয়া বলিতেছে, “যদি নিকটে কোন সতী স্ত্রী থাক, তবে আগমন করিয়া এই নদীमध्ये ভাসমান এ মৃতদেহে যে পাঁচটি মণি আছে লইয়া যাও । আমি তাহাদিগের নিমিত্তে শবস্পর্শ করিয়া অভিলষিত গলিত মাংস আহাৰ করিতে পারিতেছি না ।”

বিদ্যুল্লতা পশুপক্ষীর ভাষা জানিতেন ; সুতরাং শিবার কথা বৃদ্ধিতে পারিয়া নদ্যভিমুখে গমন করিলেন । যাইয়া দেখেন স্রোতস্বতীমধ্যে যথার্থই একটি শব ভাসিয়া যাইতেছে । তখন কল্প প্রদান পূর্বক সম্ভরণ দিয়া শবটি কূলে লইয়া আসিলেন । দেখিলেন শবটির বসনাঞ্চলের গ্রাহ্মিমধ্যে যেন পূর্ণশশধরের আভা প্রকাশ পাইতেছে । মনে মনে অসীম আনন্দিত হইয়া খুলিয়া দেখেন, যথার্থই তন্মধ্যে পাঁচটি মণি আছে ; লইয়া শবস্পর্শজন্য স্নান করত নিশী অবশান জানিয়া ব্যস্ত সমস্তে গৃহ অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন ।

বণিকরাজ ভদ্রাবলও উক্ত সময়ে প্রাতঃকৃত্য হেতু উক্ত পথে নদীর ঘাটে যাইতেছিলেন । বিদ্যুল্লতা, স্বশুরকে পথমধ্যে সমাগত দেখিয়া ভ্রীড়ায় চন্দ্রানন অবগুপ্তনে ঢাকিলেন । ভদ্রাবল, পুত্রবধু এমন সময়ে একাকিনী কোথা হইতে এখানে আইল ; বোধ করি এ দূশচরিত্রা হইয়াছে । উপপতি সঙ্গে বনমধ্যে রজনী বন্ধন করিতে-ছিল ; ইতিমধ্যে রাত্রি প্রভাত জানিয়া দ্বরিতগমনে গৃহে আগমন করিতেছে সন্দেহ নাই । যেহউক, প্রতিনিধান করিতে হইবে । কিন্তু কি করিবেন, তৎভাবনায় উৎকলিকাকুল হইয়া, ভাবিতে ভাবিতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্বক গৃহে গিয়া, একাকী এক নির্জন স্থানে বিষণ্ণবদনে বসিয়া রহিলেন । কাহার নিকট মনের কথা প্রকাশ করিলেন না ।

বিনলেন্দু প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া পিতাকে নম-

স্বাক্ষর করিতে গিয়া দেখেন, তিনি যেন অকূল ভাবনা-
মাগরে নিপতিত হইয়া আছেন । তাঁহাকে দর্শনমাত্র মুখ
ফিরাইলেন । বিমলেন্দু, ভদ্রাবলের মনোগত ভাব কিছুই
জানেন না । ভাবিতে লাগিলেন কল্য পিতাকে সর্বকাল
অতি হৃষ্টচিত্ত দেখিয়াছি ; হঠাৎ অদ্য এমন কি ঘটিল,
যে তিনি ভাবিতে ভাবিতে একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেলেন ।
ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, কারণ
জিজ্ঞাসা করিলেন ; কিন্তু কিছুই উত্তর পাইলেন না ।
পরে ক্লভাঞ্জলিপুটে বিনয়বচনে বলিতে লাগিলেন পিতঃ!
কি জন্য আপনাকে ঈদৃশ বিষাদমাগরে বিলুপ্ত দেখা
যাইতেছে ? এবং কি অন্যই বা এ দাসের সঙ্গে কথা কহি-
তেছেন না ? চরণে নিপতিত হই ; কৃপা বিতরণে ভাবনার
আদি অন্ত জানাইয়া, এ দাসকে ক্লভার্থ করিতে আজ্ঞা
হয় । যখন দেখিলেন তাহাতেও কোন ফল দর্শিল না,
তখন জননী বৎসলতার নিকটে গিয়া, অঙ্গপূর্ণলোচনে
বলিতে লাগিলেন জননি ! পিতা অদ্য আমার সঙ্গে কথা
কহিতেছেন না ; কেবল বিষমমনে কি জানি কি ভাবি-
তেছেন । চরণারবিন্দে লুপ্তিত হইয়া কতই ব্যগ্রতা করি-
লাম । কিছুই না বলিয়া অধিকন্তু মুখ ফিরাইয়া থাকি-
লেন । বলিব কি, দেখিয়া শুনিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ
হইয়া যাইতেছে । বোধ করি এ কুণ্ডলের কোন অসৎ
কর্মে রোধ-পরবশ হইয়া থাকিবেন । সত্য বলিতেছি,
পিতার মনোদুঃখ জানিতে না পাইলে নিশ্চয় প্রাণ পরি-
ত্যাগ করিব ।

বৎসলতা, ইচ্ছা পুত্রমুখে এতাদৃশ অসম্ভাবিত দুঃখ-জনক কথা শুনিতে পাইয়া, শিহরিয়া বলিতে লাগিলেন বৎস বিমলেন্দো ! তুমি কি জন্য এত উতলা হইয়াছ ? ক্লান্ত হও ! খেদ করিও না ! বোধ করি তোমার পিতা বাণিজ্য-বিষয়ের কোন অশুভ সম্বাদ পাইয়া থাকিবেন ; তজ্জন্যই এত বিষণ্ণ হইয়াছেন । বৎস ! তুমি জাননা, বণিকদিগের মধ্যে মধ্যে এমনতর অনেক ঘটিয়া থাকে । বিমলেন্দু বলিলেন জননি ! আপনি যে আজ্ঞা করিতেছেন, আমার বোধ হইতেছে, তা নয় ; কেননা, তাহা হইলে পিতার, আমার নিকট বলিতে কোন বাধা ছিল না ; বিশেষতঃ তিনি, আমাকে দেখিয়া বিষণ্ণতার আরো আধিক্য প্রকাশ করিয়াছেন । আমার একান্তই বোধ হইতেছে, মদীয় কর্তৃক কোন অসাধারণ দুর্কাহ কুকর্ম রূত হইয়া থাকিবে ; নতুবা এমন হয় না ।

বৎসলতা, যখন দেখিলেন পুত্র কোনমতেই প্রবোধ মানিল না ; তখন তাঁহাকে লইয়া ভদ্রাবলের নিকটে গিয়া বলিতে লাগিলেন প্রভো ! কি জন্য আপনি এত বিষাদ-সাগরে পতিত হইয়া আছেন ? এবং কি জন্যেইবা তাহা প্রকাশ না করিয়া, জীবনসর্বস্ব বিমলেন্দুর মুখ ইন্দু মলিন করিতেছেন ? অবলোকন করিয়া দেখুন ! প্রাণধন নন্দন আপনার ঈদৃশ দশা দেখিয়া, দুঃখে অভিভূত হইয়া চিত্তার্ণবিতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া আছে ।

ভদ্রাবল এতকাল ভাবিতে ভাবিতে নিশ্চয় করিয়াছেন, পুত্রবধু একান্তই দুশ্চরিত্রা হইয়াছে ; অতএব তাহাকে

বনবাস দেওয়া কর্তব্য । পুত্রের নিকট বলি, হয় তো তাহাকেই বনবাস দেওয়া হইবেক, নতুবা অন্ততঃ আমাকেই গৃহধৰ্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া অরণ্যে কুটার নির্মাণ করিয়া বাস করিতে হইবেক । এতাবৎ বিবেচনার পর, পুত্রকে নিকটে আসিবার ইচ্ছিত করিয়া যুদুষ্ণের বলিতে আরম্ভ করিলেন বৎস ! বলিতে চাই, আবার ভয় পাই ; যদি কথা রাখ এমত বল, তবে বলিতে পারি । বিমলেন্দু পিতার মুখে এবশ্রকার খেদাঘ্রিত বাক্য শুনিয়া প্রতিবচন প্রদান করিলেন পিতঃ ! এ কি আজ্ঞা করিতেছেন ? দেখুন, সীতাপতি জীরামচন্দ্র, পিতৃআজ্ঞায় স্নেহদ রাজহ্ম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক বৃক্ষবল্লভ পরিধান করিয়া, চতুর্দশ বৎসর বনে বনে পরিভ্রমণ দ্বারা অশেষ ক্লেশ পাইয়াছিলেন । পিতৃআজ্ঞায় পরশুরাম, তীক্ষ্ণধার কুঠার দ্বারা জননী রেণুকার প্রাণ পর্য্যন্ত ধ্বংস করিয়াছিলেন । পিতৃআজ্ঞায় যযাতিনন্দন পুরু সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত জনকের জরা গ্রহণ করিয়াছিলেন । লোকে তাঁহাদিগের ঐ সকল ক্রিয়াজনিত কর্ম্মকে পুণ্য জানিয়া, ধর্ম্ম বলিয়া অদ্যাপি সেই সকল প্রসঙ্গ শ্রবণ করে । বলিতে বলিতে নয়নযুগল হইতে অশ্রুবারি বিগলিত হইয়া বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল ।

ভদ্রাবল দেখিলেন, তিনি যাহা বলিবেন পুত্র তাহাই করিতে ব্যগ্র আছে ; অতএব বলিলেন বৎস ! বধুবিদ্যুল্লতাকে বনবাস দিতে হইয়াছে । বিমলেন্দু, এ আবার কি বিষম বিপত্তি উপস্থিত হইল ! পিতা ঈদৃশ বিষমদশ

আজ্ঞা করিতেছেন কেন ! ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না ; এবং লজ্জা ও তয়ের উদ্বেক সহকারে কারণ জিজ্ঞাসু হইতে না পারিয়া, যে আজ্ঞা মহাশয় বলিয়া, সারথিকে ডাকিয়া বলিলেন, অতি সত্বর এক খান রথে অশ্বসংযোগ করিয়া লইয়া আইস, অতি প্রয়োজন আছে । বলিয়া উপকাননস্থ শয়নাগারে গিয়া দেখেন বিদ্যুল্লতা দর্পণে আপন প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতেছেন । স্বামি দর্শনে পুলকিত হইয়া বলিলেন নাথ ! আজি আপনাকে এত বিমনা দেখা যাইতেছে কেন ? একটি শুভ সংবাদ আছে ; যদি মনঃসংযোগ করিয়া শ্রবণ করেন, বলি । বিদ্যুল্লতা যে মণিবৃত্তান্ত বলিবেন, বিমলেন্দু ইহা বুঝিলেন না ; বুঝিলেন অন্য কোন কথা বলিবেন ; সেমতে সে কথায় মনোনিবেশ না করিয়া পিতৃআজ্ঞা অগ্রকাশ রাখিয়া বলিলেন প্রিয়ে ! যদি পিত্রালয়ে যাওয়ার বাসনা হয়, আমার সঙ্গে চল ; রথ প্রস্তুত আছে । আমার কোম কার্য্যপাতিকে তথায় যাইতে হইয়াছে ।

বিদ্যুল্লতা বুঝিলেন যথার্থই পিত্রালয়ে যাইবেন ; অতএব রথারোহণে সত্বর করিতে লাগিলেন । এমন সময়ে সারথি আসিয়া বণিকপুত্র-সমীপে নিবেদন করিল মহাশয় ! রথ প্রস্তুত হইয়াছে ; আরোহণ করিলেই হয় । বিমলেন্দু কান্ডার কর গ্রহণ পূর্ব্বক রথাকূট হইলেন । পাচনী আঘাতে অশ্বগণ বাহুবলে বিপিনাভিমুখে ধাবমান হইল । দিগবাসনে কুর্বাদেব অস্তাচল-চূড়াবলয়ী

ইহলে, যামিনী রুক্ষবর্ণ বস্ত্র পরিধান করতঃ, যাত্রার পূর্বে সহচরী সন্ধ্যাকালকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিলেন ।

বিমলেন্দু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন - অরণ্য অতি নিকট ইহিয়াছে, রজনীও সমাগত প্রায় । অদ্য রথসহ সারথিকে বিদায় দেওয়া যাউক ; কল্য কোন কৌশল করিয়া ভার্ঘ্যাকে এই বনে রাখিয়া গৃহে প্রতিগমন করা যাইবেক । পরে নিরতিশয় শোকাবেগচিন্তে ব্যপদেশ করিয়া বলিলেন প্রিয়ে ! এই অরণ্যে ভয়ঙ্কর দস্যু-ভীতি আছে ; রথারোহণে গমনাপেক্ষা বরং দরিদ্রবেশে এই বনাতিক্রম করা ভাল ; তোমার অলঙ্কার সকলও খুলিয়া বস্ত্রে প্রচ্ছাদিত করিয়া লও, সাবধান যেন তাহা দেখা না যায় ; পরে নগর নিকটবর্তী ইহলে পুনর্বার পরিধান করিতে পারিবে । আর সারথিও রথ লইয়া এখান হইতে কিরিয়া যাউক । বিদ্যুল্লতা, স্বামিবাক্যে বিশ্বাস পূর্বক অঙ্গ হইতে অলঙ্কার সকল উন্মোচন করত বস্ত্রাবৃত করিয়া লইলেন, এবং দরিদ্রবেশে দুর্গম বস্ত্রাতিক্রম করিতে প্রস্তুত হইলেন । বিমলেন্দু রথ-সহ সারথিকে বিদায় দিয়া, ভার্ঘ্যাসহ পদভ্রমে বনের ঘোরতর মধ্যপ্রদেশে যাত্রা করিলেন । একেত ঘোরতর অরণ্যানী ; তাহাতে আবার ঘনতর ঘনঘটাধারা গগনগুণ আচ্ছন্ন হইয়া নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার ইহিয়াছে । বিমলেন্দু দারুণ ভাবনা ও পথশ্রান্তে ক্লান্ত হইয়া এক মহীকুমূলে বিশ্রামার্থে গিয়া, বিদ্যুল্লতাকে বলিলেন দেখ ! আমি অদ্য আর চলিতে পারি না । হাটিতে হাটিতে ভূনিও শ্রান্ত হইয়া থাকিবে ;

আইস অদ্য এই বৃক্ষতলে বিশ্রাম করি । নিশী অব-
সানে গম্যস্থানে গমন করিব । বিদ্যুৎলতা বলিলেন নাথ !
যাহাতে আপনার অভিরুচি, তাহাই আমার প্রার্থিতব্য ।
আপনি শয়ন করুন ; আমি আপনার চরণসেবা দ্বারা
শ্রম সফল করি । বলিয়া শিরীষ কুসুমাপেক্ষা সুকুমার
কোমল করপল্লবে স্বামীর চরণসেবায় প্রবর্ত হইলেন ।
বিমলেন্দু এতাদৃশী পতিপরায়ণা হিতৈষিণী প্রণয়িনীকে
কিষ্কপে এঘোর অটবীমধ্যে বিসর্জন করিয়া যাইবেন ;
ভাবিতে ভাবিতে কিংকর্তব্যাবধারণে বিমূঢ় হইয়া স্রুশুপ্তি
প্রাপ্ত হইলেন ।

বিদ্যুৎলতা, স্বামিসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া ভাবিতে লাগি-
লেন, আমার স্বামী ও পিতা উভয়েই প্রচুর ধনস্বামী;
অতএব স্বামীর ঈদৃশী দরিদ্রাবস্থায় স্বশুরালয়ে যাওয়া
কোনমতেই সম্ভব বোধ হইতেছে না । যে একখানি রথ
সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাহাও বিদায় দিলেন । প্রত্যুত
আমিত পিতালয়ে আরও গমনাগমন করিয়াছি ; কিন্তু
এতাদৃশ কষ্টগম্য পথ তো আর কখনও নয়নগোচর
হয় নাই । বিশেষতঃ, যাত্রাকালাবধি ইঁহার মুখারবিন্দ
যেন ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে ; স্বশুরালয়ে যাইতে
হইলে এত ম্লান হওয়ার বিষয় কি ? তবে মনে এই লই-
তেছে, আমি যে শব হইতে মণি লইয়া গৃহে যাইতেছি-
লাম, তখন স্বশুর মহাশয় আমাকে দেখিয়াছিলেন ;
বোধ হয়, তাহাতেই তিনি আমাকে দুষ্টরিত্রা জ্ঞান
করিয়া বনবাস পাঠাইয়া দিলেন । অধিকন্তু দেখা

যাইতেছে, স্বামী যেন আমাকে কিক্রপে বনবাসরূপ দণ্ড-
বিধান করিবেন, কেবল তাহার চেষ্টাতেই নানা ব্যপদেশ
করিতেছেন । ইহা ভাবিতে ভাবিতে ম্লানমুখী হইয়া হা
বিধাতঃ ! তুমি কি আমার ললাটে এই লিপি করিয়া-
ছিলে । ইহা কহিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ।

বিদ্যুল্লতা এইরূপ খেদ বিকাশ করত অশ্রুনারীবে বক্ষঃ-
স্থল অভিষিক্ত করিতেছেন ; এমন সময় শুনিতে পাইলেন
ঐ বৃহদ্রণ্যের কোন অংশে এক বায়স বলিতেছে “যদি
নিকটে কোন পতিপরায়ণা সতী স্ত্রী থাক, তবে এই যে
মৃতসর্প-শিরে দুই মণি আছে, আসিয়া ইহা গ্রহণ কর” ।
বিদ্যাপ্রভাবে বিদ্যুল্লতা বায়সের কথা বুঝিতে পারিয়া
মনে মনে কহিতে লাগিলেন, একবার পঞ্চ মণি পাইয়া,
এই দশা ঘটিল ; আবার এ কি শুনিতে পাই ? এবৎ চিন্ত
কেন মণিলোভে চঞ্চল হইতেছে ? হৃদয় ! স্থির হও !
মণিলাভের লোভ সম্বরণ কর ! তোমার কপালে যদি
সুখই থাকিবে, তবে একবার পাঁচমণি পাইয়াছিলে, তাহা-
তেই হইত ! দেখ, অধিক কি, তাহাতে আরো দুঃখের
বৃদ্ধিই হইল ! বিপুল ধনস্বামীরাও যখন অল্প ধনের লোভ
সংযমন করিতে পারেন না, তখন এত বহুমূল্য মাণিক্য ;
যাহার “এক একটি সাত রাজার ধন” বলিয়া কথিত
আছে ; কিক্রপে তাহার লোভ সম্বরিয়া থাকিতে পারা
যায় । পরিশেষে লোভপরবশ হইয়া মণি আনয়নার্থে
কাকস্বর লক্ষ্য করিয়া নিবিড় অরণ্যানীর এক প্রান্তভাগে
যাইয়া দেখেন, যথার্থই এক মৃতকণিশিরে দুইটি মণির

কিরণে তৎস্থান আলোকময় করিয়াছে ; কাক, বৃক্ষশাখায় বসিয়া আছে । তখন সর্পশিরঃস্থিত মণি দুইটি লইয়া পূর্ক সঞ্চিত পঞ্চটী মণির সঙ্গে বসনাঞ্চলের এক গ্রন্থিতে বন্ধন করিলেন । এমনকালে বায়স, পক্ষিদেহ পরিত্যাগ পূর্কক গন্ধর্কদেহ প্রাপ্তে বিমান যানারোহণ করিয়া বলিতে লাগিল পতিপরায়ণা বিদ্যুজ্জতে! অদ্য তোমার শুভাগমে, আমি জন্মান্তরীণ শাপ হইতে উদ্ধার পাইলাম । আশীর্বাদ করি, মণি লইয়া পতিসহ গৃহে বাইয়া পরমসুখে কালান্তিপাত কর । বিদ্যুজ্জতা এই অসম্ভাবিত কাণ্ড দর্শনে, সর্বাশ্রয়চিন্তে এতদ্ব্যর্থ জ্ঞাত হওয়ার অভিনায়ে জিজ্ঞাসা করিলেন প্রভো! আপনি কে? এবং কি নিমিত্ত কাকদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? অদ্য কি গতিকে গন্ধর্ক কলেবর প্রাপ্ত হইলেন? গন্ধর্ক বলিল তুমি আমাকে শাপোন্মুক্ত করিলে, প্রমোত্তর দ্বারা তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত । অতএব বলিতেছি ; আমার বিষয় শ্রবণ কর ।

ধরণীকৌলক হিমালয় পর্বতের শিখরে, কলিঙ্গদ নামে এক গন্ধর্ক বাস করেন । আমি তাহার আশ্রয়, নাম অরিন্দম ! আমি, অসভ্য সমবয়স্কদিগের সহিত সর্কদা খেলা করিয়া বেড়াইতাম ; শাস্ত্রচিন্তা প্রভৃতি সংকর্মে ক্ষণকালের নিমিত্তেও মনোনিবেশ করিতাম না । পিতা, আমাকে সময়ে সময়ে উপদেশ হলে কতমত ভংসনা করিতেন ; কিন্তু কিছুতেই আমার সেই দুষ্পু বৃত্তির নিবৃত্তি হইল না ; বরং ক্রমে ক্রমে এমন সমৃদ্ধি হইল যে, আমি

কুকর্ম ব্যতীত থাকিতে পারিতাম না । পরিশেষে পিতা আর আমার বিষয়ে উপায়ান্তর না দেখিয়া, বলিলেন যে দুষ্টরিত্র ! আমি আর তোর মুখাবলোকন করিব না ; তুই আমার দৃষ্টিপথের অন্তর হ । আমার এ সকল কথায় কি যায় আসে ; সুতরাং স্বমতাবলম্বী বয়স্যগণের সহিত কেবল দৃষ্টিবৃত্তির অনুকরণেই কালযাপন করিতে লাগিলাম ।

পশুহিংসায়, আমার মনোবৃত্তি প্রবৃত্তি ছিল । একদিন আমি মৃগয়ার্থে, বয়স্যগণ সমভিব্যাহারে হিমালয় পর্বতের এক প্রান্তভাগে যাইয়া, বহুবিধ জীবহিংসা করিয়া, অন্তে একটি মৃগশাবক দেখিতে পাইয়া, তৎপতি ইষু নিক্ষেপ করিলাম । দৈবগতিকে তাহা তাহার গাত্রবিদ্ধ না হইয়া, স্থানান্তরে গিয়া পতিত হইল । হরিণশিশু, প্রাণভয়ে পলাইতে লাগিল । আমি পুনর্বার শরাসনে শরসন্ধান পূর্বক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলাম । শাবকটি দৌড়িতে দৌড়িতে যেন কোথায় গেল, আমি আর দেখিতে পাইলাম না । তখন রাত্রি হইল দেখিয়া বয়স্যগণের উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলাম । এক মুনি-কুটারের নিকট দিয়া আসিতেছি, এমন সময়ে দেখিতে পাইলাম উক্ত কুটারের মধ্যে পূর্ণ শশধরের আভা প্রকাশ পাইতেছে । ধীরে ধীরে পর্ণশালাভিমুখে যাইয়া, বৃত্তির অন্তরাল হইতে উকি দিয়া দেখিলাম, মুনি ঘরে নাই ; মুনিপত্নী শয়ান আছেন । তখন মণি অপহরণ করিবার মানসে কুটারমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মণি লইয়া বাহির হইতেছি, ইত্যবসরে মুনিপত্নী নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া

বলিলেন রে পাপাত্মন ! তুই গন্ধৰ্বকূলে জন্মধারণ করিয়া,
 ব্রাহ্মণের বস্ত্র অপহরণ করিতে আসিয়াছি। বলিয়া
 সরোষবচনে শাপ প্রদান করিলেন, রে হতভাগ্য ! যেমন
 তুই মণিলোভে এনত দুৰ্দ্ধ কৰ্ম করিলি ; তেমনি মণিধারী
 ফণী হইয়া গিয়া পৃথিবীতে থাক্ ! দারুণ শাপ শুনিয়া
 আমার হৃৎকম্প হইতে লাগিল । তখন মুনিপত্নীর চরণ-
 কমলে নিপতিত হইয়া, ভক্তিসহকারে বলিতে লাগিলাম
 জননি ! উদ্ধার কর ! উদ্ধার কর ! তোমার অবোধ সন্তান
 না বুঝিয়া একটা গর্হিত কৰ্ম করিয়াছি ; তজ্জন্য যে জন-
 নীর এতাদৃশ কোপে পতিত হইব, তাহা পূর্বে বুঝিতে
 পারিয়াছিলাম না । এখন উদ্ধার কর ! মুনিপত্নী আমার
 কাতরোক্তিতে সদয়া হইয়া, সৰুগ বচনে কহিতে আরম্ভ
 করিলেন বৎস ! আমি সাধী স্ত্রী, আমার বাক্য অথগ্য ;
 কোন মতেই শাপের অন্যথা হইবেক না । তোমাকে
 সৰ্পকলেবর ধারণ করিতেই হইবে । তবে এই বলি, দিনে
 সৰ্প-কলেবর ধারণ পূৰ্ব্বক এই মণিদ্বয় শিরে ধারণ করিয়া
 থাকিবে, তাৎক্ষণিক কাকাবয়র প্রাপ্ত হইয়া সতীর
 অন্বেষণ করিবে । যৎকালে মাদৃশী পতিব্রতা নারীকে
 এই মণি দান করিতে পারিবে; তৎকালে শাপমুক্ত হইয়া
 পুনর্বার গন্ধৰ্বকলেবর পাইতে পারিবে । তদবধি আমি
 সৰ্প ও কাকাজ্ঞ প্রাপ্ত হইয়া এখানে আছি । অদ্য তোমার
 শুভ আগমনে শাপোন্মুক্ত হইলাম, বলিয়া শূন্যপথে
 অদৃশ্য হইল । বিদ্যুৎস্রোত শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া
 পতির নিকট গমন করিলেন ।

এদিকে বিমলেন্দু নিদ্রা হইতে চৈতন্য পাইয়া দেখেন রমণী নিকটে নাই। ভাবিতে লাগিলেন, চতুর্দিকে ভয়ঙ্কর হিংস্র পশুগণের নিনাদ শুনিতেছি, নাজানি তাহারা আমার প্রেয়সীকে ভক্ষণ করিল, কিম্বা সে কি বনবাস রত্নান্ত বৃক্ষিতে পারিয়াই কোন কুপমধ্যে বস্প দিয়া আত্মঘাতিনী হইল। হা জগদীশ্বর! বল দেখি কোন খানে গেলে আমার প্রাণসমা নিরুপমা প্রেয়সীকে পাইতে পারিব? ভাবিতে ভাবিতে “হা হতোস্মি” বলিয়া ধীহারা হইয়া ভুমিতলে পতিত হইলেন। কিঞ্চিদ্বিলম্বে চৈতন্য হইলে ক্ষিপ্তের ন্যায় ইতস্ততঃ সেই বামলোচনা স্ত্রীরত্নের গবেষণা করিতে লাগিলেন। এমত কালে দেখেন, সেই সর্ষাপসুন্দরী গজেন্দ্রগমনে ঈষদ্ধাস্য বদনে অরণ্যের কিয়দংশ উজ্জ্বল করিয়া আসিতেছেন। দেখিতে পাইয়া সন্দেহ জন্মিল, এ অবশ্যই কুলটী হইয়া থাকিবেক; নতুবা এ বোর অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশীথ সময়ে এই বৃহদরণ্য মধ্যে কোথা হইতে একাকিনী হাসিতে হাসিতে আসিতেছে? বোধ করি, এখানে ইহার উপপতি আসিয়া থাকিবে; তৎসঙ্গে কৌতুকবিলাসে মগ্না ছিল; শেষে আমার নিদ্রাবসান কাল জানিয়া আসিতেছে। এখন কি কর্তব্য! এখানে রাখিয়া গেলে উপপতিসহযোগে পাপাচরণ করিবেক; অধিকন্তু একথা দেশে দেশে প্রকাশ পাইয়া আমার অখ্যাতি হইবেক; অতএব ইহার প্রাণদণ্ড করাই সর্বতোভাবে বিধেয়।

বিদ্যুৎপ্রভা ইত্যাবসরে সন্মুখীন হইলে, বিমলেন্দু ক্রোধ-

কম্পান্বিত কলেবরে কহিতে লাগিলেন রে পাপীয়সি !
 রে দুষ্চারিণি ! তোর স্বভাব আমি জানিতে পারিয়াছি ।
 এই জনোই পিতা, তোকে বনবাস দিতে আজ্ঞা করিয়া-
 ছেন । তোর কি কিছুই ভয়সঞ্চার হইল না যে, আমি
 তোর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছি । বিদ্যুল্লত। বৃষ্টিতে পারি-
 লেন, স্বামী তাঁহাকে অনঃস্বভাবা-জ্ঞানে ভৎসনা করিতে-
 ছেন । তখন আনুপুর্ষক মণিবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া, অঞ্চল
 হইতে মণি সপ্তটি খুলিয়া স্বামীর চরণে ধারণ পূর্বক
 বলিতে লাগিলেন নাথ ! আপনি এই মণি সাতটি লইয়া
 গৃহে গিয়া সুখে কালযাপন করুন । আর কি, ভগবান
 আমাকে যে দশাতে ফেলাইয়াছেন, আমি তাহাই স্বীকার
 পূর্বক তাঁহার আরাধনায় সমাধি করিতেছি, বলিয়া
 বাপ্পাকুললোচনে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ।

মহাধনায়জ, পত্নীর মুখে মণিবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া,
 আনন্দনীরে অভিষিক্ত হইয়া, বলিলেন প্রিয়ে ! আমি না
 জানিয়া তোমাকে কলঙ্কারোপ পূর্বক দুর্কিসহ তিরস্কার
 করিয়াছি ; এবং পিতাও আদি অন্ত না জানিয়া, বনবাস
 দেওয়ার আজ্ঞা করিয়াছেন ; কিন্তু এ আমাদিগের দোষ
 নয় । বিবেচনা করিতে পার, সর্কাল জগন্নিয়ন্তা জগ-
 দীশ্বরের ইচ্ছাতে হয় ; কিছুই মনুষ্যে করিতে পারে না ।
 অতএব প্রিয়ে ! খেদ সম্বরণ কর ! চল, রজনী প্রভাতে দুই
 জনেই গৃহে প্রতিগমন করি । পিতা মাতা, মণিবৃত্তান্ত
 শুনিলে না জানি কত হুট্ট হইবেন । আর চক্ষু হইতে
 বারিধারা নির্গত করিও না ; তদ্রূপে আমি দশ দিক

শূন্যাকার দেখিতেছি । বিদ্যুৎলতা বলিতে লাগিলেন নাথ !
 এই সংসার কেবল মায়াপ্রপঞ্চ । দেখুন, যখন সুস্থশরীরে
 কোন আনন্দজনক কর্মে লিপ্ত থাকা যায় ; তখন ইহ
 সংসার কেবল আনন্দভুবন বলিয়া বোধ হইতে থাকে ।
 আর যখন অসুস্থ কলেবর অথবা কোন একটা দুঃখজনক
 ব্যাপার উপস্থিত হয় ; তখন সেই আনন্দময় সুখধামকে
 কেবল দুঃখভাণ্ডার বলিয়াই প্রতীয়মান হয় । আরো
 দেখুন, অদ্য সম্রাট, কল্য দীন ; অদ্য অপার আনন্দিত,
 কল্য মহা দুঃখিত ; অদ্য আশাতীত নবসৌভাগ্য লাভ-
 জনিত মহোৎসাহ, কল্য পূৰ্ব্ব সম্পত্তি নাশ হেতু অপার
 দুঃখ ; অদ্য লোকের নিকটে আদৃত, কল্য অপযশ বিস্তার
 জন্য মনঃক্ষুণ্ণ ; অদ্য প্রাণাধিক নন্দনের মুখচন্দ্রমা দৃষ্টে
 চিত্তচকোরের তৃপ্তিলাভ, কল্য তাহার শবোপরি অশ্রুবর্ষণ
 দ্বারা হৃদয়কে বিদীর্ণ করা ; অদ্য কপ লাভ্য-বিশিষ্ট
 সুন্দর কলেবর এবং আশাতে বদন প্রফুল্ল, কল্য ব্যাধি-
 দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সকল আশা নষ্টকারী মৃত্যুর মুখে
 নিপতিত হওয়া ! হায় ! হায় ! সকলি ক্ষণভঙ্গুর ; কিছুই
 চিরস্থায়ী নয় ! যিনি এই মায়া ও দুঃখময় সংসারকে
 অনিত্য জানিয়া, সেই নিত্য পরিশুদ্ধ পরাংপরকে
 জানিতে পাইয়া তাঁহার আরাধনায় নিযুক্ত হইয়াছেন ;
 তিনিই ধন্য । অতএব, আমার আর এই অনিত্য বিষময়
 সংসারে ইচ্ছা নাই । বিনলেন্দু বলিলেন প্রিয়ে ! যাহা
 বলিতেছ, যথার্থ বটে ; কিন্তু পতি-পরায়ণা সতী কামিনী-
 দিগের পক্ষে সৰ্ব্ব পুণ্যকৰ্ম্মাপেক্ষা পতিসেবাই সৰ্ব্বতো-

ভাবে পুণ্যকর্ম । সতী স্ত্রী, পতিসেবায় অবিরত অনুরক্ত থাকিবেক, ইহাই সনাতনশাস্ত্রসিদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত ।

বিমলেন্দুর এতাদৃশ প্রাণতোষিণী চাটুকার বাক্যে, বিদ্যুজ্জ্বলতা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন প্রাণপাতে ! আপনি যে আজ্ঞা করিতেছেন, সে অতি যথার্থ । কিন্তু আপনার পিতার তাদৃশ গর্হিত আচরণে নিতান্ত ঘৃণা হইতেছে । বলিতে কি, আমার এ দুঃখ কোন দিনই অন্তর হইতে অন্তর হইবে না । বিনয় করি, আপনি আর এ দাসীকে পুনর্বার গৃহে যাওয়ার আজ্ঞা করিবেন না ; কেননা, এ দাসীর আর গৃহধর্ম ইচ্ছার লেশমাত্রও নাই । প্রত্যুত তদ্বিষয়ে পরম্পরে আরো ভয় ও অবজ্ঞাই হইতেছে । বিমলেন্দু শুনিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বাক্শক্তি রহিত হইয়া থাকিলেন । পরিশেষে বলিলেন যদি একান্তই গৃহে প্রত্যাগমন না করিবে, তবে আমারও আর গৃহে বাইয়া আবশ্যক নাই । আমি এখনি সম্ভাপিত হৃদয়কে প্রাণপরিত্যাগরূপে বারি সেচন দ্বারা শীতল করিতেছি । আহা ! কি মতে আমি এতাদৃশী স্বান্দিভক্তা পরম-হিতৈষিণী রমণীকে, এ ঘোর অরণ্যে হিংস্রক সিংহ শার্দূল প্রভৃতি জন্তুগণের ভক্ষ্য করিয়া দিয়া বাইব ? আবার বলিলেন প্রিয়ে ! জানত শাস্ত্রে লিখিত আছে, সাদ্বী স্ত্রী স্বামীকে কোন দশাতেই ত্যাগ করিবে না । তাহার একটি সদুপাখ্যান বলিতেছি : শ্রবণ কর ।

অবাস্তনগরে, অশ্বপতি নামে সর্ষপুণপতি এক নরপতি

ছিলেন । তিনি, অনেককাল পর্য্যন্ত সন্তান সন্ততি অভাবে নিতান্ত দুঃখিত থাকিয়া, পরিশেষে দেবারাধনা-দ্বারা এক রূপনিধান কন্যানিধানের মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করিয়া, আপনাকে ক্লতার্থ জ্ঞান করিলেন । কন্যার নাম সাবিত্রী রাখিলেন । সাবিত্রী রূপ লাভণ্যে নিরূপমা । অনঙ্গজায়াও তাঁহাকে দেখিলে আপনাকে ন্যাকার করিয়া, তাঁহাকে ধন্যজ্ঞান করিতেন । নরপতি অশ্বপতির একমাত্র দুহিতা বিধায়, রাজা তাঁহাকে শাস্ত্রাভ্যাসও করাইয়াছিলেন । তাহাতে তিনি বিলক্ষণ বিচক্ষণা হইয়া, সর্ষগুণাধারা বলিয়া লোকতঃ প্রকাশ পাইয়াছিলেন । ক্রমে ক্রমে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, রাজা উপযুক্ত বর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ।

এক দিন সাবিত্রী, সমবয়স্কা পরিচারিকাগণ সঙ্গে লইয়া, তপোবনে মহর্ষিগণের সহিত শাস্ত্রালাপ, এবং তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার দেখিতে গিয়াছিলেন । বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের সহিত নানাপ্রকার সদালাপ করিয়া, আপন ভবনে প্রত্যাগমনকালে দেখিলেন, ঐ অরণ্যে পর্ণকুটির নির্মাণ পূর্ব্বক এক অঙ্গ ও এক বৃদ্ধা এবং এক যুবা বাস করিতেছেন । ঐ যুবর এবং সাবিত্রীর চারি চক্ষুর সন্মিলন হইলে, স্বরদশাপ্রভাবে চিত্তার্পিতের ন্যায় একে অন্যকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । সখীগণ, তাঁহাদিগের এই ভাব দর্শনে, সাবিত্রীকে বলিল সখি ! তোমার এ কেমন রীতি ? তুমি, যুনিগণ সঙ্গে দেখা করিবার কথা রাজাকে বলিয়া আসিয়াছ ; এখন তুমি এখানে

আসিয়া সাম্বিকভাবে প্রভাবে, ঐ যুবা পুরুষের দিকে চাহিয়া রহিলে । বলিতে কি, ইহা দৃষ্টে আমাদিগের নিতান্ত যুগা হইতেছে । ছি মেনে, বড়ই লজ্জার কথা । সাবিত্রী বলিলেন প্রিয়সখীগণ ! তোমাদের এ কথায় আমি মনোযোগ দিতে পারি না । দেখ, আমার মন ঐ সর্দাম্প-সুন্দর চোর চুরি করিয়াছে । তোমরা আমার ঐ মনচোরকে আনিয়া দিয়া মনোরথ পূর্ণ কর । সখীগণ দেখিল সাবিত্রী নিতান্তই অধীরা হইয়াছেন, তখন আর কি করে ।

তদনন্তর সাবিত্রী, সখীগণ দ্বারা পরিচয় লইয়া জানিলেন, ঐ বৃদ্ধের নাম দমসেন । তিনি পূর্বে অবন্তির রাজা ছিলেন । বৃদ্ধাবস্থায় অন্ধ হইলে তদীয় শত্রুগণ, তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছে ; সুতরাং আপন পত্নী ও শিশুসন্তান সত্যবানকে লইয়া, ঐ তপোবনে আসিয়া বাস করিতেছেন ; শুনিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন ; এবং মনে মনে মন-মালা সত্যবানের গলে প্রদান করিয়া বলিলেন প্রিয়সখীগণ ! আমি ঐ যুবা পুরুষকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিলাম । অদ্যাবধি আমি উহার ভাণ্ডা, এবং উনি আমার পতি হইলেন । বেলা অবসান হইয়াছে, চল এখন গৃহাভিমুখে গমন কর ।

সাবিত্রী, সখীগণ সঙ্গে আলায়ে প্রত্যাগত হইয়া, জন-নীর নিকটে যাইয়া বলিলেন জননি ! অদ্য আমি তপোবনে গিয়া, একটি যুবা পুরুষকে বিবাহ করিয়া আসিয়াছি । মর্হী কহিলেন সে কি বাছা ! আমি তপোবনে কাহাকে

বিবাহ করিলে? তপোবনে ত কষিগণ ব্যতীত আর কাহারো বসতি নাই। সাবিত্রী কহিলেন না মা! তা নয়। পরিচয় লইয়া জানিয়াছি, তিনি অবন্তি নগরের পূর্বাধিপতি দমসেন রাজার তনয়, নাম সত্যবান। রাণী সত্যবানকে বিশিষ্টরূপে জানিতেন; তাহাতেই মনে মনে কহিলেন তনয়া, উপযুক্ত পাত্রকেই মনোনীত করিয়াছে। এখন পরমেশ্বর উভয়কে চিরজীবী করিয়া রাখুন।

অনন্তর রাণী, কন্যার পরিণয় বৃত্তান্ত রাজাকে জানাইলে, রাজা হর্ষপ্রযুক্তচিত্তে বিবাহের আয়োজন উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে এক দিবস, ঋষিরাজ নারদ তম্বিকেতনে আগত হইলেন। রাজা যথাবিহিত অভ্যর্থনা করিয়া, বসিতে আসন প্রদান করিলেন। মহর্ষি আশীর্বাদ করিলেন ‘সদা মঙ্গলং ভবতু’। পরে আসন পরিগ্রহণান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, শুনিতে পাই, আপনি নাকি রাজ্যচ্যুত রাজা দমসেনের পুত্র সত্যবানের সঙ্গে সাবিত্রীর বিবাহ দেন? রাজা বলিলেন হাঁ, সে সত্য বটে। ভাল হইল, ভাল কথাই উপস্থিত করিয়াছেন; এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, আপনার ত সকল স্থানেই যাতায়াত আছে; আমি তাহাকে দেখি নাই; কেবল লোক-মুখে শুনিয়াছি পাত্রটি নাকি ভাল। কেমন মহাশয়! ছেলেটির বিদ্যা বুদ্ধি রূপ লাভ্য কেমন আছে? আমার দুহিতার উপযুক্ত তো? তপোধন কহিলেন হাঁ পাত্রটি লেখা পড়াতেও ভাল; এবং দোখিতে শুনিতেও সুন্দর

বটে । রাজা কহিলেন দেবতে ! শ্রুত আছি, আপনার জ্যোতিষ বিদ্যায় ভাল ব্যুৎপত্তি আছে, গণনা করিয়া দেখুনদেখি, তাহার পরমায়ু কি ? নারদ মুনি, রাজবাক্যে ভূমে খড়ি ধরিয়া কহিলেন মহারাজ ! পরমায়ুতে ত কেবল অম্প দেখা যাইতেছে; সত্যবান আর এক বৎসর মাত্র নাঁচিবেক ।

রাজা, মুনি-মুখে এবড়ুত বিষময় কথা শ্রবণ করিয়া, অন্তঃপুরে গিয়া কন্যাকে বলিলেন বাছা সাবিত্রী ! মর্হর্ষি নারদ আসিয়াছিলেন ; তিনি গণনা করিয়া কহিয়া গেলেন, সত্যবানের আর এক বৎসর পরমায়ু আছে । শুনিয়া ক্রোধের আতঙ্ক হইতেছে । আমার ইচ্ছা, অন্য এক সুকপ গুণযুত রাজনন্দনের সহিত তোমার বিবাহ হয় । অতএব বলি, দেশ বিদেশ হইতে রাজতনয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা যাউক । তুমি স্বয়ম্বর হও । সাবিত্রী বলিলেন পিতঃ ! এ কি আজ্ঞা করিতেছেন যে, অন্য পুরুষকে বরণ করিয়া দুর্লভ সতীত্ব-ধনকে বিসর্জন দিব ? বিধাতা যদি আমার কপালে বৈধব্যযন্ত্রণা লিখিয়াই থাকেন, তবে তাহা কোন মতে ছাড়ান যাইবে না । রাজা বলিলেন বৎসে ! কন্যাদানের সম্পূর্ণ অধিকারী পিতা মাতা । আমরাতো কেহই বাগদান করি নাই যে, তোমারে সত্যবানকে সম্প্রদান করিব ? তবে ইহাতে কি দোষ হইতে পারে ? সাবিত্রী কহিলেন, পিতঃ ! আপনাদিগের কোন দোষ হইতে পারে না বটে, কিন্তু যখন সেই মনো-হর গুণনিধান সত্যবানকে আমি মনে মনে পতিত্বে বরণ

করিয়াছি, তখনই তাঁহার গৃহিণী হইয়াছি । বিশেষতঃ তৎ-
কালে আমি সখীগণকে সম্বোধিয়া সত্যবানকে দেখাইয়া
বলিয়াছিলাম যে অদ্যাবধি উনি আমার স্বামী, এবং আমি
উঁহার ভার্য্যা হইলাম । এখন তাহার অন্যথা হইলে,
বলুন দেখি, প্রতিজ্ঞাত্রাণের পাপ কোথায় যায় ?

রাজা, সত্যবানে সাবিত্রীর দৃঢ় অনুরাগ জানিয়া, পরি-
শেষে অগত্যা বিবাহে সম্মত হইয়া, পুরোহিতকে ডাকিয়া
বিবাহের উপযুক্ত আয়োজন প্রস্তুত করিতে কহিলেন ।
এবং স্বয়ং তপোবনে যাইয়া, যথাবিহিত সমাদরে সত-
বানকে আলয়ে আনিয়া, কন্যা সম্প্রদান করিলেন । বিবা-
হানন্তর সত্যবান সাবিত্রীকে লইয়া গৃহে গিয়া পরম সুখে
কালযাপন করিতে লাগিলেন ।

সত্যবান, বন হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিয়া তদ্বিক্রয়
দ্বারা জনক জননী এবং ভার্য্যার গ্রাসাচ্ছাদন যোগাই-
তেন । সম্বৎসর কাল এইরূপে অতীত হইল । সাবিত্রী
মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, সম্বৎসরকাল অতীত হই-
য়াছে ; এখন আর স্বামীর সঙ্গছাড়া হওয়া কর্তব্য নয় ।
অদ্য স্বামী যে অরণ্যে যাইবেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে গমন
করিব । ইতি চিন্তা করিতেছেন, এমনকালে সত্যবান বন-
যাত্রার আয়োজন করিলেন । সাবিত্রী কহিলেন স্বামিন্ !
বহুকালাবধি আমার অরণ্য দর্শনের নিতান্ত অভিলাষ
আছে ; অদ্য আমি আপনার সঙ্গে যাইয়া বনের শোভা
দর্শন করিব । সত্যবান বলিলেন প্রিয়ে! বনে কত কত
হিংস্রক পশুদির ভয় আছে ; তুমি অবলা, স্বভাবতঃ

ভীৰু; অতএব তোমার বনগমন করা কর্তব্য নয়। ইত্যাদি কত প্রকার বুঝাইলেন, কিন্তু সাবিত্রী তাহা না শুনিয়া নিতান্তই বনগমনের প্রয়াস জানাইলে, অগত্যা সত্যবান সাবিত্রীকে লইয়া বিপিনে গমন করিলেন।

উভয়ে বনে যাইয়া, মামা প্রকার ফল মূল আহরণ পূৰ্ব্বক কাষ্ঠ আহরণ করিতে করিতে সত্যবানের শিরঃ-পীড়া হইল। সত্যবান কাষ্ঠ আহরণে নিবৃত্ত হইয়া, সাবিত্রীকে বলিলেন প্রিয়ে! আমার শিরঃপীড়া হইয়াছে। আর কাষ্ঠাহরণ করিতে পারি না, বিশ্রাম করিতে চাহি; ইহা বলিয়া সাবিত্রীর উরুদেশে মস্তক রাখিয়া ভূমি-শয্যায় শয়ন করিলেন। ক্রমশঃ সত্যবানের শরীর অবশ হইতে লাগিল। সাবিত্রী বুঝিতে পারিলেন সত্যবানের কাল পূর্ণ হইয়াছে; যে ইউক, ধৰ্ম্মরাজ নিতান্তই আমাকে পতিহীনা করিবেন, এমনত বোধ হইতেছে। ভাল, দেখা যাউক, তিনি কেমন করিয়া আমার পতির প্রাণ লইয়া যান! ইহা বলিয়া সত্যবানকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া থাকিলেন। নিয়মিত সময়ে ক্লান্ত, সত্যবানের প্রাণ হরণার্থে দূত প্রেরণ করিলেন। যমদূত আসিয়া দেখে সাবিত্রী তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন; অতএব এতাদৃশী সতীকে স্পর্শ করিয়া সত্যবানের প্রাণহরণ করিতে অপারক হইয়া, ধৰ্ম্মরাজের নিকট গিয়া আহু-পুক্ষীক নিবেদন করিল।

ধৰ্ম্মরাজ স্বয়ং সত্যবানের প্রাণ-হরণার্থে নির্দিষ্ট বিপিন মধ্যে উপস্থিত হইয়া, সত্যবানের জীবন লইয়া

প্রস্থান করিলেন । সাবিত্রী দেখিলেন রুতান্ত স্বয়ং আগমন করিয়া সত্যবানের প্রাণ লইয়া বাইতেছেন । তখন ক্রন্দন করিতে করিতে রুতান্তের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে প্রবর্ত্ত হইলেন । যম দেখিলেন সাবিত্রী পতিশোকে অধীরা হইয়া, তাঁহার পাছে পাছে আসিতেছেন । তাঁহার ক্রন্দনে রূপা-পরবশ হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন বৎসে সাবিত্রি ! তুমি কি জন্যে একাকিনী এঘোর নিশীথ সময়ে আমার অনুসরণ লইয়াছ ? বিধাতা তোমার কপালে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাই হইয়াছে । অদৃষ্টের লিপিতে কে খণ্ডাইতে পারে ? আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিলে আর কি হইবে ? যাও বাছা ! গৃহাভিমুখে প্রতিগমন কর । সাবিত্রী কহিলেন ধর্ম্মরাজ ! পতিই ভার্য্যার জীবন-সর্ব্বস্ব, পতিহীনা অবলার ইহ সুখময় সংসার কেবল দুঃখাধার বলিয়া প্রতীয়মান হয় । আপনি আমার সেই জীবন সর্ব্বস্ব স্বামিধন লইয়া যাইতেছেন ; আমার আর বাঁচিয়া থাকা কেবল বিড়ম্বনা ভোগমাত্র ! অতএব প্রার্থনা করি, হয় আমাকে পতি প্রদান করুন ; নতুবা আমাকেও নাথের অনুগামিনী করুন । রুতান্ত কহিলেন সাবিত্রি ! আমি তোমার অনুনয়ে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলাম । বিধাতার লিপি খণ্ডন করিতে আমার ক্ষমতা নাই । অতএব তুমি স্বামিপ্রাণ ব্যতীত অন্য বর প্রার্থনা কর । সাবিত্রী, শ্বশুর দীর্ঘ কালাবধি রাজ্যচ্যুত এবং অন্ধ হইয়া আছেন, এই সুযোগে তাঁহার বিষয় কিছু প্রার্থনা করি, তাবিয়া কহিলেন ধর্ম্মরাজ ! যদি একান্তই আমাকে স্বামিপ্রাণ

না দেন। তবে এই প্রার্থনা যে আমার স্বশুর বহুকাল-
বধি অন্ধ এবং রাজ্যচ্যুত হইয়া আছেন। তাঁহাকে
পুনরায় রাজ্যাধিপতি এবং চক্ষুরত্ন দান করিয়া সুখী
করিতে আজ্ঞা হয়। যম, তখাশু বলিয়া যাইতে আরম্ভ
করিলেন। সাবিত্রী পুনরায় তাঁহার অনুসরণ লইলেন।

কতক দূর গিয়া রুতান্ত পশ্চাৎ অবলোকন করিলেন,
এবং সাবিত্রী পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন, দেখিতে
পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন সাবিত্রী! কি জন্য তুমি আবার
আমাব অনুগামিনী হইয়াছ? সাবিত্রী কহিলেন রুতান্ত!
কি কহিব, পতিশোকে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাই-
তেছে। আপনি আমার সেই পতিপ্রাণ লইয়া যাই-
তেছেন; বলুন দেখি, কেমন করিয়া আমি স্মৃতির থাকিতে
পারি? অন্তক বলিলেন সত্যবানের জীবন ব্যতীত যদি
আর কিছু তোমার প্রার্থন্যিতব্য থাকে, বল; আমি
তোমার সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিতেছি। সাবিত্রী বলি-
লেন মৃত্যুপতে! পিতা একাল পর্য্যন্ত অপুত্রক আছেন,
তাঁহাকে পুত্র বর দিতে আজ্ঞা হয়। অন্তক, সাবিত্রীর
প্রার্থনানুসারে নরপতি অশ্বপতিকে পুত্রবর প্রদান করিয়া
গমন করিলেন। সাবিত্রী তখনও তাঁহার পাছ ছাড়া
হইলেন না।

যম, কিছুদূর গমন করিয়া, আবার পশ্চাদ্ধিকে দৃষ্টি
করিয়া দেখেন, সাবিত্রী পুনরায় তাঁহার পাছে পাছে
আসিতেছেন। তদীয় নয়নযুগল দৃষ্টে বোধ হইতেছে
যেন, তাহা শোক-সাগরের উৎস স্বরূপ হইয়া অবিরত

বাষ্পাবারি বিনির্গত করিতেছে ; এবং মুখ-সুখাকর মলিন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আবার কেশকবরী উন্মুক্ত হইয়া, কাদম্বিনী সদৃশ হইয়া সেই মলিন-চন্দ্রানন ঢাকিয়া রাখিয়াছে । পতি-শোকে সাবিত্রীর এমত দূরবস্থা দেখিয়া, ধর্মরাজ রূপাপরবশে বলিলেন বাছা সাবিত্রি ! আর ক্রন্দন করিয়া, আমার পাছে পাছে আসিলে কি কল দর্শিবেক ? তোমার কপালে বৈধব্যযন্ত্রণা আছে ; বল দেখি, তাহা আমি কেমন করিয়া খণ্ডাই ? ভাবিয়া চিন্তিয়া কি করিবে ? সকলই পূর্বজন্মেব তপস্যার ফলাফল । যাও বাছা, এখন গৃহে যাইয়া সেই দুঃখ সুখদাতার তপস্যা কর ; তিনিই তোমার সকল দুঃখ দূর করিয়া, চরমে আশ্রয় দিবেন । তোমার এতাদৃশী অবস্থা দেখিয়া নিরতিশয় দয়া জন্মিয়াছে বটে ; কিন্তু কি করি, যদি সত্যবানের প্রাণ বিনা আর কিছু প্রার্থনীয়তব্য থাকে, বল ; তোমাকে সে বর দিতেছি । সাবিত্রী সুযোগ পাইয়া বলিলেন প্রভো ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রার্থনা করি, আমার যেন স্বামির ঔরসে এক শত পুত্র হয় । কৃতান্ত সাবিত্রীর অনুনয়ে দয়াপরবশে বিমুক্ত হইয়া “অভীষ্ট সিদ্ধির্ভবতু ” বলিয়া গমন করিতে লাগিলেন ।

কিয়ংকালান্তে আবার যখন পশ্চাদিকে দৃষ্টি করিলেন, তখনও সাবিত্রীকে দেখিতে পাইয়া কিঞ্চিৎ কোপ প্রকাশ পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি আবার কোথায় যাইতেছ ? সাবিত্রী বলিলেন প্রভো ! রাগ করিবেন না ; আপনিইত আমাকে বর দিয়া আসিয়াছেন যে, আমার স্বামির ঔরসে

এক শত পুত্র উন্মিবেক । এখন পতির প্রাণ লইয়া কোথায় যাইতেছেন ? মৃত্যুপতি বুঝিতে পারিলেন সত্যবানের পুনর্জীবিতের বর দেওয়া হইয়াছে । তখন বলিলেন বৎসে সাবিত্রী ! আমি তোমার বুদ্ধির কোশলে, এবং পতিপরায়ণতা দৃষ্টে নিতান্ত তুষ্ট হইয়াছি । ধর, আমি তোমাকে তাহার প্রসাদ স্বরূপ সত্যবানের প্রাণদান করিলাম । তুমি পতি সহ গৃহে গিয়া, পরম-সুখে কালযাপন কর । ইহা বলিয়া যমরাজ অন্তর্দ্বান হইলেন ।

সত্যবান পুনর্জীবন প্রাপ্তে সুশ্রোত্বিতের ন্যায় উঠিয়া সাবিত্রীকে বলিলেন প্রিয়ে ! এত রাত্রি হইয়াছে, তুমি আমাকে জাগরিত কর নাই কেন ? নাজানি পিতা মাতা কি ভাবিতেছেন । সাবিত্রী, মৃত্যুব্রতান্ত অপ্রকাশ রাখিয়া বলিলেন নাথ ! স্বামির নিদ্রাভঙ্গে অধর্ম জানিয়া, আমি আপনাকে জাগরিত করি নাই । চলুন, এখন গৃহাভিমুখে যাত্রা করি ।

তৎপর দিবস প্রত্যুষে, সাবিত্রী সত্যবান সঙ্গে গৃহে যাইয়া দেখেন, দমসেন অন্ধ হইতে মোচন পাইয়া রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন । দেখিয়া আহ্লাদের সীমা পরিসীমা রহিল না । রাজা দমসেন পুত্র, পুত্রবধুর বন হইতে গোণে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা দ্বারা আদ্যোপান্ত জানিয়া, অগাধ সুখার্ণবে মগ্ন হইলেন । পরিশেষে বৃদ্ধতা প্রযুক্ত আপনাকে রাজত্বের অনুপযুক্ত জানিয়া, রাজপুত্র সত্যবানকে রাজ্যেশ্বর করিয়া দিয়া, আপনি নিশ্চিন্ত হই-

ইতিমধ্যে এই সংবাদ রাজপুরমধ্যে প্রকাশ পাইলে, অগ্রজ রাজপুত্রদ্বয় রাজকর্মচারিগণসমভিব্যাহারে, সভায় উপস্থিত হইয়া দেখেন, রাজার চক্ষুদ্বয় হইতে ক্রোধে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইতেছে ; ঘাতকগণ কনিষ্ঠরাজ-কুমারের বধোদ্যোগ করিতেছে । কেহই এতদ্ব্যর্থ বুঝিতে পারিলেন না । জ্যেষ্ঠ রাজকুমার ক্রুতাজলি হইয়া, অতি কাতরভাবে জনকসমীপে নিবেদন করিলেন, পিতঃ ! কি হইয়াছে ? পিতঃ ! কি হইয়াছে ? প্রার্থনা করি জানাইতে আত্মা হয় । রাজা তৎপ্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া কেবল রাজপুত্রের বধেরই আত্মা প্রদান করিতে লাগিলেন । তখন জ্যেষ্ঠ রাজকুমার কনীয়ানের দৈদৃশ্য বিষম বিপদ উপস্থিত দেখিয়া, পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, ধর্ম্মাবতার ! অবিচারে কর্ম করা উচিত নহে । শাস্ত্রজ্ঞেরা পুনঃ পুনঃ ইহা কহিয়া গিয়াছেন যে “ভাবিয়া করিও, যেন করিয়া ভাবিতে না হয়” । মহারাজ ! পূর্বকালে এক ব্রাহ্মণ একটি পোষিত শূককে অবিচারে বধ করিয়া পশ্চাৎ যেমতে সবংশে নষ্ট হইয়াছিল তদুপাখ্যান কহিতেছি, শ্রবণ করিয়া বিহিত করিতে আত্মা হয় ।

একদা এক ব্যাধ, পক্ষিধরগাশয়ে বাঙুরা বিস্তার করিয়াছিল । দৈবগতিকে এক শূক্রেন্দ্র, সহস্র শূক সমভিব্যাহারে উক্ত জালে বদ্ধ হইল । ব্যাধ জাল কুড়াইয়া লইয়া শূকসমূহকে পিঞ্জরস্থ করিলে শূকরাজ ব্যাধদ্ব্য-ধনে বলিতে লাগিল. নিষাদ । আপনি এত শূকদ্বারা কি

করিবেন ? তদন্তরে যুগযু বলিল, আমরা ব্যাধজাতি ; শুকপক্ষী স্বীকার করিয়া তদিক্রয় দ্বারা অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকি । শুক বলিল, এ সহস্র পক্ষী বিক্রয়দ্বারা আপনার কত লভ্য হইবে ? ব্যাধ বলিল সহস্র মুদ্রা লভ্য হইবে । শুকরাজ, ব্যাধকে সহস্র মুদ্রা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি হইয়া, সঙ্গীশুকসহস্রকে মুক্ত করিয়া দিল ।

ব্যাধ, শুকেন্দ্রকে পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া নিকটস্থ নগরে শ্বেতকুশ নামক এক ব্রাহ্মণের আশ্রমে উপস্থিত হইল । ব্রাহ্মণ শুকবিক্রেতার নিকট জিজ্ঞাসা করিল, শুকের মূল্য কত ? ব্যাধ বলিল মহাশয় ! পাখীর মূল্য পাখীর নিকট জিজ্ঞাসা করুন । শুক বলিল মহাশয় ! আমি ব্যাধকে সহস্র মুদ্রা দেওয়ার অঙ্গীকার করিয়াছি ; সহস্র মুদ্রা হইলেই আমাকে ক্রয় করিতে পারিবেন । শ্বেতকুশ মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, এ পাখীটি আপন মূল্য আপন মুখেই এত বলিতেছে, বোধ করি, ইহার বিশেষ কোন গুণ আছে ; সাত পাঁচ ভাবিয়া সহস্র মুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক পাখীটি ক্রয় করিয়া রাখিল ।

কিয়দিনানন্তর শ্বেতকুশ অতি উৎকট পীড়ায় পীড়িত হইল । শত শত বৈদ্যগণ চিকিৎসা করিল, কিন্তু কিছুতেই উপশম হইল না । শ্বেতকুশ মনে মনে জীবনের আশা হইতে এককালে নৈরাশ প্রায় হইল ; অধিকন্তু, ভাবিয়া ভাবিয়া দিন দিন আরো কাতর হইতে লাগিল ।

শুক মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, ইনি দীর্ঘকাল

আমাকে পালন করিয়াছেন, এবং সমধিক মুদ্রাদ্বারা আমাকে ক্রয় করিয়াছেন, এ সময়ে সাধ্যপর্যন্ত উপকার করা আমার পক্ষে নিতান্ত কর্তব্য কর্ম ; বিশেষতঃ যদি আমার দ্বারা ইহাৰ বিশেষ কোন উপকার হয়, তবে পরিণামে আরো সুখে থাকিতে পারিব সন্দেহ নাই । ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া এক দিবস ব্রাহ্মণকে বলিল মহাশয় ! আপনি অতি দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত আছেন, যদি এক দিনের জন্যে আমাকে বনে বাইতে দেন তবে আমি বোধ করি, আপনার পীড়ার উপশম-যোগ্য ভেষজ আনয়ন করিয়া দিতে পারি । শ্বেতকুশ বিবেচনা করিতে লাগিল, শুক পলায়নের চেষ্টা করিতেছে । আবার ভাবিয়া দেখিল, আমি যে রোগে আক্রান্ত হইয়াছি, ইহা হইতে মুক্ত হওয়া সুকঠিন, সুতরাং আমার বাঁচা না হইলে এ শুক দ্বারা কি লভ্য হইবে । নানাবিধ চিকিৎসকদ্বারা চিকিৎসা করাইয়া, চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য হওয়ার আশাতে প্রায় জলাঞ্জলি দেওয়া গিয়াছে ; তবে কি 'দৈববল বড় বল' বাহউক্ত শুককে ছাড়িয়া দেওয়া যাউক । ইত্যাদি চিন্তা করিয়া দ্বীয় বন্ধু বান্ধবগণ সহ পরামর্শ পূর্বক শুককে ছাড়িয়া দিল ।

শুক পিঞ্জরমুক্ত হইয়া প্রথমতঃ বহুকাল-বিচ্ছেদিত স্বজাতিমণ্ডলে প্রবেশপূর্বক নানাপ্রকার আনন্দ প্রমোদ করিয়া, শেষ শ্বেতকুশেব উপশম-যোগ্য ঔষধ লইয়া যাত্রা করিবে, এমন সময়ে মনে হইল, যদি ব্রাহ্মণপত্নী জিজ্ঞাসা করেন, আমার জন্যে কি আনিয়াছ ? তখন কি

উত্তর দিব? তাঁহার জন্যে কিছু লওয়া আবশ্যিক।
পরিশেষে একটা রক্তবর্ণ ফল চক্ষু পুটে লইয়া, বিজাগারে
পাঁছছিল। ব্রাহ্মণ শুকদর্শনে নিতান্ত পুলকিত হইয়া
তদানীত ভেষজ সেবনদ্বারা ক্রমে ক্রমে শারীরিক সুস্থতা
লাভ বোধ করিতে লাগিল।

শুক, আনীত রক্তবর্ণ ফলটি বিপ্রপত্নীকে দিয়া বলিল
জননি! আপনার জন্যে এই ফলটি আনিয়াছি; এই
ফলের গুণ কি বলিব, দেবতাগণও এমত ফল অতি বিরল
পাইয়া থাকেন। ইহা ভক্ষণ করিলে কুৰূপা সুকূপা হয়;
বদীর্ঘসী পূর্ণ যুবত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রার্থনা করি, আপনি
ইহা ভক্ষণ করিয়া এ দাসের শ্রম সফল করুন। বিপ্র-
জায়া নিতান্ত হর্ষোৎফুল্লচিত্তে ফলগ্রহণ পূর্বক স্বীয় স্বামী
শ্বেতকুশের সমীপে ফলের আনুগুণ্যক বিবরণ জ্ঞাপন
করাইয়া বলিল প্রভো! এইক্ষণে এই ফলটি রোপণ করিয়া
রাখা যাউক; সময়ানুসারে এমত বহুফল পাইতে পারিব।
ব্রাহ্মণ বলিল, ইহাই কর্তব্য। এইমত পরামর্শান্তে দম্পতি
ফল লইয়া নিজাবাসের এক নির্জন স্থানে রোপণ করিল।
ক্রমে অঙ্কুরাদি জন্মিয়া, কালক্রমে ফলবৃক্ষ ফলবান
হইল। একদা বিপ্রভাৰ্যা ফলবৃক্ষ দর্শনাশায় গিয়া দেখে,
বৃক্ষটি গোড়া হইতে সরলভাবে প্রায় ছাদশ হস্ত দীর্ঘ
হইয়াছে; হরিৎবর্ণ শত শত শাখা প্রশাখা তরুতুর্দিকে
উৎপন্ন হইয়াছে; পীতবর্ণ পত্রগুলি শ্বেতবর্ণ করিয়া
অলিতেছে; খোপায় খোপায় ফল নিচয় পক হইয়া
বৃক্ষের শোভা সম্পাদন করিয়াছে; বায়ুভরে শাখাপ্রশাখা-

লেন । সত্যবান রাজ্যাধিপতি হইয়া মহামুখে রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন ।

বিমলেন্দু এইরূপে সাবিত্রীর উপাখ্যান আদ্যোপান্ত সমাপন করিয়া বলিলেন প্রিয়ে ! সাধ্বী স্ত্রী স্বামীকে কোন দশাতেই ত্যাগ করিবে না । শুনিলে ত পতিব্রতা সাবিত্রী কিহতে মৃত স্বামী সত্যবানকে পুনর্জীবিত করিলেন । তুমি সাবিত্রী সদৃশী পতি-পরায়ণা হইয়া, কিহতে জীবিত স্বামীকে ত্যাগ করিতে চাও ? আর যদি পিতার অনবধানতা প্রযুক্ত বনবাসরূপ বিসম্ভ্রমে তোমার নিত্য-স্তই খেদ হইয়া থাকে : কিন্তু আমি তোমাকে লইয়া, গৃহে যাইয়া, পিতাকে আদ্যন্ত বিবরণ জ্ঞাত করাইয়া, তোমার সে খেদ নিবারণ করাইতেছি । বিশেষতঃ পিতা এতাবস্থান্ত জ্ঞানিতে পারিলে না জানি কতই সন্তুষ্ট হইবেন, বলিয়া দীননয়নে বিদুশ্লতার মুখপানে ঈক্ষণ করিয়া রহিলেন ।

তখন বিদুশ্লতা, নাথের যে দশা দেখিতে পাইতেছি, আমি গৃহে প্রতিগমন না করিলে ইনিও গৃহে গমন করিবেন না । এবং কিসে কি বিবেচনা করিয়া, যদি শেষে প্রাণই পরিত্যাগ করেন ; সুতরাং আমাকে পুনর্বার গৃহে যাইতে হইয়াছে । মনে মনে চিন্তা করিয়া বলিলেন নাথ ! আপনি আর অশ্রুবিদ্ধ ত্যাগ করিবেন না ! তদর্শনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে । আপনি যে আত্মা করিতেছেন, আমি তাহাতে সম্মতা হইলাম । দীনে ধন, বনভ্রষ্ট পশুতে বন, নগিহারা ফণা নগি, সরো-

জিনী দিনমণি, কুমুদিনী চন্দ্রকে দেখিলে, কোকিল বসন্তাগমে, প্লবঙ্গ বর্ষাগমে, যাদৃশ সন্তুষ্ট হয়, বিমলেন্দু ভাষার গৃহে প্রত্যাগমনের অভিপ্রায়ে তদপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন প্রাণাধিকে ! তোমার ইদৃশ সুধাময় বাক্যে আমি নিতান্ত বাধিত হইলাম ।

দম্পতীর এই সকল কথোপকথনে নিশা অবসান হইল । পূর্ষদিক্ আরক্তবর্ণ দেখিয়া, উভয়ে আপনাবাসে যাত্রা করিতে করিতে দিবাবসান হইল । মার্ত্তণ্ডদেব অন্তা-চলচূড়া অলবয়ন করিলেন । বিমলেন্দু বিদ্যুল্লতা সঙ্গে ভবতীপুর নগরে আপনাবাস বাটীর সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া বিদ্যুল্লতাকে বলিলেন প্রেয়সি ! তুমি বাটীর বহির্দেশে কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা কর ; আমি গিয়া পিতাকে আনু-পূক্ষীক বিবরণ জ্ঞাত করণানন্তর তোমাকে আসিয়া লইয়া যাইব । নতুবা সহসা তোমাকে পিতার সন্মিকটে লইয়া গেলে কি জানি কিসে কি বিবেচনা করেন । ইহা বলিয়া তাঁহাকে বাটীর অন্তরালে দণ্ডায়মান রাখিয়া পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ।

ধনপতি ভদ্রাবল বাটী ছিলেন না । সন্ধ্যাকালিক সমীরণ সেবনার্থে নদীতটে গিয়াছিলেন । গৃহে প্রত্যাগমন কালে পুত্রবধু সহাস্যবদনে রাজপথে দণ্ডায়মান আছেন, দেখিতে পাইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ইহাকে পুত্র-সহিত কল্য বনবাস পাঠাইয়াছি । পুত্র এখন পর্য্যন্ত গৃহে প্রত্যাগত হন নাই । ইতিমধ্যে এই দুষ্টারিণী কোথা হইতে কিমতে এখানে আসিল । মনে

অশেষ সন্দেহ হইতেছে । এ অতি খলচরিত্রা ; নাজানি পুত্রকে একাকী নিহৃত স্থানে পাইয়া তাঁহাকে প্রাণে নষ্ট করিল ; এবৎ ইহাও হইতে পারে যে, এখন আমাকে সংহার করিতে পারিলেই ইহার অভীষ্ট সিদ্ধি হয় । যে হউক, এখন আর ইহাকে জীবিত রাখা কর্তব্য নয় ; কেননা, শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন “ দুষ্টা স্ত্রী যমস্বরূপা ” ভাবিতে ভাবিতে ক্রোধপরবশে কম্পান্বিত-কলেবর হইয়া, করস্থিত দণ্ড দ্বারা সেই কপবতী পতিব্রতা সতী বিদ্যুজ্বলতার মস্তকে আঘাত করিবা-মাত্র, পতিপরায়ণা গুণবতীর মর্ত্যলীলা সম্বরণ হইল । পথবাহী মনুষ্যাগণ, ভদ্রাবলের এতাদৃশ আচরণ দৃষ্টে সকলেই এই হতাজনক কাণ্ডের আমূল জানিতে উক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া পরম্পর কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল ।

বণিকনন্দন বিমলেন্দু গৃহে যাইয়া জানেন ভদ্রাবল বাটী নাই । অতএব তাঁহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে-ছিলেন, এমনকালে ঐ নিদারুণ সাংঘাতিক স্থলে লোক-কোলাহল শুনিতে পাইয়া, দৌড়িয়া যাইয়া দেখেন, বিদ্যু-জ্বলতা ভুমিশয়ায় শয়িতা আছেন । প্রাণবায়ু এই দৃঃখময় সংসার পরিত্যাগ পূর্বক সুখধান-স্বর্গারোহণ করিয়াছে । দেখিয়া অমনি হা হতোম্মি ! বলিয়া ধীহারা হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন । কিঞ্চিৎদিলম্বে চৈতন্য পাইয়া বলিতে লাগিলেন প্রিয়ে ! কি দোষারোপ করিয়া আমার সম্মত পরিত্যাগ করিলে ! কি বলিয়াই বা তোমায় বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট বিদায় হইল ! কোন দৃঃখে দৃঃখিনী হইয়া

ভূমিতে শয়ন করিয়া মৌন হইয়া আছি ! হায় ! আর কি
আগি তোমার প্রফুল্ল বদন দর্শন করিয়া নয়নযুগল চরিতার্থ
করিতে পারিব ! আর কি তোমার মুখ-বিনির্গত সুমধুর
মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া, আনন্দের কণবিবর পরিতৃপ্ত
হইবে ! আহা ! আমি এখনও প্রাণসনার নিধনে জীবিত
আছি ! রে দূরন্ত ক্রতান্ত ! তোর মনে কি এই ছিল যে,
আমাকে প্রেমসীর শোকানলে দগ্ধ করিবি ! হে ধর্ম !
তুমি এত দিনে মিথ্যা হইলে ! হে প্রাণ ! তুমি আর কত
কাল এদেহে থাকিয়া যাতনা দিবে ? পিতঃ ! আপনি কি
নিরুদাচরণ করিলেন ! আপনি জানেন না আপনার পুত্র-
বধূ মিরতিগয় সুশীলা এবং পতিপরায়ণা । দেখুন, সে
সতীত্ববলে এই সপ্তটি মণি প্রাপ্ত হইয়াছে । পরে মণি
প্রাপ্তির সমুদায় বিবরণ বিজ্ঞাপন করিয়া, বলিলেন,
ইচ্ছাঅয়ের গাহা ইচ্ছা ছিল, তাহাই হইয়াছে । হে বন্ধু-
বান্ধবগণ ! আপনারা আমাকে একটা ছত্যাশনকুণ্ড প্রস্তুত
করিয়া দিউন । আমি তাহাতে কম্প প্রদান পূর্বক এ
সন্তাপিত হৃদয়কে প্রাণবিসর্জন-রূপ বারি সেচন দ্বারা
শীতল করিতেছি । সকলে কত গতে কত বুঝাইলেন ।
বিমলেন্দু কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না । পরিশেষে
এক অধিকুণ্ড সাজাইয়া দিলে, বিমলেন্দু তাহাতে কম্প
প্রদান পূর্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন ।

বদিকপত্নী বৎসলতা, পুত্র ও পুত্রবধূর নিধন সংবাদে
শোকে অভিভূতা হইয়া, উল্লু প্রজ্জ্বলিত ছত্যাশনকুণ্ডে
কম্প দিয়া পুত্র, পুত্রবধূর সঙ্গিনী হইলেন । তখন ভদ্রাবল,

আমি বিচার না করিয়া নিরপরাধিনী পুত্রবধূকে সংহার করিয়া, কি কুৰ্ম্ম করিলাম ! হায় ! আমায় এমন নতি কেন হইল ! হা পুত্র ! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে ! বলিতে বলিতে পুত্র কলত্রশোকে অধৈর্য হইয়া উল্ল চিত্তামধ্যে ঝাঁপ দিয়া পুত্র, পুত্রবধূ এবং ভার্য্যার অন্তর্গামী হইলেন । এইমতে ক্রমে ভদ্রাবলীর বন্ধুবান্ধব এবং প্রভুভক্ত দাস-দাসীগণ প্রাণ বিসর্জন করিল ।

মধ্যম রাজনন্দন এই উপন্যাসটী সমাপন করিয়া রুতাজ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন নরপতে ! অবিচারে কৰ্ম্ম করিলে চরণে অনেক দুর্ঘটনা সম্ভাবনা । বিশেষতঃ রাজার পক্ষে অবিচারে কৰ্ম্ম করা শাস্ত্র ও যুক্তি বিরুদ্ধ । সেনাতে নিবেদন করি, অশ্রু কর্ত্তক কি অপরাধ রুত হইয়াছে, জানাইতে আজ্ঞা হয় । পরে বিচারদ্বারা যদি দোষই সাব্যস্ত হয়, তবে অবশ্যই দণ্ডবিধান করা যাইবে ।

রাজা, এতাবৎ কথার প্রতি কিছুই মনোনিবেশ করিলেন না ; বরং রোষের বন্ধিতে অসহিষ্ণু হইলেন । যাতকগণ বধের গৈথিল্য করিতেছে, তদৃষ্টে মহাক্রোধাক্ত হইয়া, স্বয়ং করে ভয়াবহ স্মৃতিস্ত বিশাল খাদ্য ধারণ পূর্বক পুত্রের নিধনে উদ্যোগ করিলেন । রাজকুমার প্রাণাশে এককালে নৈরাশ জানিয়া কহিলেন মহারাজ ! আপনি জনক হইয়া করুণারনে বর্জ্জিত হওত, যেমন অবিচারে আমাকে বধ করিতেছেন ; তেনন আমি শাপ প্রদান করিতেছি :—যদ্রূপ পাবাণ-হৃদয়-স্বরূপ কৰ্ম্ম করিলেন ।

তদ্রূপ পাষণ্ড কলেবর হইয়া এ মহাপাপের ভোগ করুন ; বলিতে বলিতে রাজা খজ্জাঘাতে তাঁহার জীবন শেষ করিলেন । অনুজের এতাদৃশ হৃদয়-বিদীর্ণকর নিধন দৃষ্টে, বড় রাজনন্দনদ্বয় শোকমাগরে নিমগ্ন হইয়া, তৎক্ষণাৎ খজ্জাঘাতদ্বারা আপন আপন জীবনত্যাগ করিলেন । সভাস্থ পারিষদগণ, এতৎ ভয়াবহ কাণ্ড দেখিয়া চমৎকার-রসের আবির্ভাবে একে অন্যের দিকে ঈক্ষণ করিয়া রহিলেন ।

“অসৎকর্মের বিপরীত ফল” প্রসিদ্ধই আছে । অকাল-বিলয়ে রাজার শরীর দৃঢ় হইতে লাগিল ; দেখিতে দেখিতে সর্গদ্বন্দ্ব পাষণ্ডময় হইয়া, সিংহাসনে মৃত্যুকার পতিত হইলেন ; এবং ইন্দ্রিয় সমূহের স্ব স্ব শক্তির অভাব হইল ; ও তদবধি কিছুকাল পরে “যেমন কর্ম তেমন ফল” এই বাক্যটি তদীয় মুখ হইতে বিনির্গত হইতে লাগিল । পাত্রমিত্রগণ, রাজাকে হঠাৎ এমন বিপদগ্রস্ত দেখিয়া শান্তিজন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিয়া, তৎপ্রতিকারে পরা-জুখ হইয়া, অবশেষে এই অটবীমধ্যে রাখিয়া গেল ।

রাজকুমার জয়দত্ত, এতাবৎ বলিয়া ধনপতি হেমচন্দ্রকে বলিলেন মহাশয় ! সেই ত্রিদ্বার নগরের অধীশ্বর জীবৎসল রাজা, অবিচারে পুত্রবধূর্জনিত পাপে পাষণ্ড হইয়া এখানে আছেন । ধনস্বামী হেমচন্দ্র শুনিয়া সুখ-সলিলে অবগাহিত হইলেন ; এবং রাজনন্দন জয়দত্তকে কন্যাদান করিবেন, মনে মনে নিশ্চয় করিয়া তৎসমভিব্যাহারে বাটী যাইয়া, বন্ধু-বান্ধবগণকে ডাকাইয়া বিব-

হের উদ্যোগ করিতে আজ্ঞা দিয়া, স্বয়ং পুরোহিত ও জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণকে লইয়া বিবাহের লগ্ন স্থির করিলেন। নির্ণীত দিনে বণিকগৃহে বিবাহোপলক্ষে স্থানে স্থানে নানা প্রকার নৃত্যগীত হইতে লাগিল। হেমচন্দ্র বন্ধুবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সভামণ্ডপে বসিয়া লগ্নের প্রতীক্ষায় নৃত্যগীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে ইন্দ্রহেম নামে এক গন্ধর্ষ বিমানযানে আগমন পূর্বক গায়াবলে হেমপ্রভাকে অচৈতন্য করত, হরণ করিয়া আকাশপথে পলায়নপর হইল। পরিচাকিাগণ তদৃষ্টে চমৎকৃত হইয়া ব্যস্তমগ্নস্তে বণিকপত্নীর নিকটে যাইয়া বলিল ঠাকুরাণি! বলিব কি, আমরা সকলে পরিবেষ্টিত হইয়া হেমপ্রভা বসিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে কি আশ্চর্যঘটনা হইল, দেখিতে পাইলাম; তিনি শূন্যমার্গে উঠিতে উঠিতে ক্রমে ক্রমে নয়নপথের অন্তর হইলেন। বণিকপত্নী শুনিয়া হা হতোম্মি বলিয়া অননি ভূমিশয্যায়া শয়িত হইলেন। ক্রমে ক্রমে এই কথা বণিকপুরের তাবতে শুনিয়া, সকলেই বিষাদমাগরে নিব্ব হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। জয়দত্ত ভাবিভাগ্যার শোকে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া, সম্মানবোধ ধারণপূর্বক তদদ্ব্যেগে বণিকেব আলয় হইতে নির্গত হইলেন।

জয়দত্ত, এইরূপে হেমপ্রভার অন্বেষণ করিতে করিতে নানা প্রদেশ অতিক্রম করিয়া, পরিশেষে এক অরণ্যানী প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন উক্ত গহন বহুস্থান ব্যাপিয়া, নানাপ্রকার পাদপাদিতে অতি শোভনীয় হইয়া আছে;

রক্তের শাখায় আখায় বিমোহন গীতগায়ক বিহঙ্গাবলি, কেলিকুতুহলে বিরাজ করিতেছে । জয়দত্ত পথশ্রান্তে এবং জলপিপাসায় একান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং জলচর পক্ষিগণের কলরব লক্ষ্য করিয়া, এক সরসীতীরে উপস্থিত হইলেন তথায় রক্তচ্যুত সুবাদু ফল পাইয়া তদ্বক্ষণ পূর্বক জলপানে গতক্লম হইয়া, সুগন্ধ গন্ধ-বহের মন্দ মন্দ সঞ্চালনে প্রফুল্লচিত্তে ইতস্ততঃ অট্যাট্যা করিতে লাগিলেন ।

এইপ্রকার ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ অরণ্যানীর এক প্রান্তদেশে গিয়া দেখিতে পাইলেন, নানাপ্রকার পশু-পক্ষীর অবয়ব প্রস্তরময় হইয়া আছে । রাজকুমার নিতান্ত কোতুকাবিষ্ট হইয়া পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিমিস্রেক্ষণ করত দেখেন তিনি যাহার জন্যে সম্যগিবেশ ধারণ পূর্বক দেশবিদেশ পর্যটন করিয়া অশেষ ক্লেশ পাইতেছেন, সেই সর্দার-সুন্দরী বণিককুমারীর প্রস্তরময় প্রতিকপও সেখানে আছে । তখন মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন আমি যাহার জন্যে দেশ বিদেশ পর্যটন করিতেছি, এই প্রস্তরময় প্রতিকপ-সমূহमध्ये তাহার অবয়ব দেখিতে পাইতেছি । যেহউক, বোধ করি ইহা কোন দৈব ঘটনাক্রমে হইয়া থাকিবে । কেননা, দেখা যাইতেছে কত দেশবিদেশী মনুষ্য এবং বিবিধপ্রকার পশুপক্ষী প্রস্তর হইয়া আছে । এখন স্পর্শ করা কর্তব্য নয় । কিন্তু কি করিবেন, তৎভা-নায় বিমূঢ় হইয়া, হাটিতে হাটিতে বনের এক প্রান্তভাগে গিয়া এক মনোহর শোভনতন মন্দির দেখিতে পাইয়া

তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন । ঐ মন্দিরমধ্যে, মহামায়া মহেশ্বরী মহেশ-মনোমোহিনীর প্রতিরূপ স্থাপিত ছিল । জয়দন্ত, তদবলোকনে বিপুল আনন্দাধিকারী হইয়া বন হইতে বিবিধপ্রকার পুষ্প চয়ন করিয়া আনিয়া, ভক্তিভাবে ভবজায়ার পূজা সমাপন পূর্বক স্তব করিতে লাগিলেন;—
তোমার প্রসাদাৎ সুরগণ, অসুর ভয় হইতে নিকৃতি
পাইয়া অদ্যাপি স্মৃতে স্বর্গে বিরাজ করিতেছেন ; তোমার
প্রসাদাৎ দশরথাস্বজ রামচন্দ্র, মহাবল কপিবল সহ দুরন্ত
লঙ্কেশ্বরকে সবংশে সংহার পূর্বক মীতা উদ্ধার করিয়া,
চতুর্দশ সহস্র বর্ষ পর্যন্ত অকণ্টকে রাজ্য ভোগ করিয়া-
ছেন । হে ত্রিলোকেশ্বরি জগজ্জননি ! তুমি শরণাগত
ভক্তগণের মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া থাক, এই নিমিত্তে
আমি তোমার স্তব করিতেছি ।

গিরীশনন্দিনী নৃপতনয়ের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, বলিতে লাগিলেন বৎস ! আমি, তোমার অর্চনায় সন্তুষ্টা হইয়াছি ; এখন বর প্রার্থনা কর । জয়দন্ত বলিলেন জননি ! যদি প্রসন্না হইয়া থাক ; তবে এই বর দাও ; আমি যাহার উদ্দেশে আসিয়াছি, যেন তাহাকে প্রাপ্ত হই । দেবী বলিলেন বৎস ! তুমি, আমার চরণামৃত লইয়া উক্ত শিলাময় মূর্তি সকলে ছড়াইয়া দাও ; তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে । বলিয়া অন্তর্ধান হইলেন ।

ভূপতিনন্দন, দেবীর আদেশানুসারে চরণামৃত লইয়া পাণাণবৎ মূর্তি সকলে ছিটাইয়া দিলে, খেচর বিহঙ্গা-বলি উড়্‌ডীয়মান হইয়া এবং বনচর জন্তু নিকর দৌড়িয়া

দৌড়িয়া চলিয়া গেল । কেবলমাত্র বণিকনন্দিনী হেম-
প্রভা, এবং এক গন্ধর্ষকুমারী, সুপ্তোখিতের ন্যায় চৈতন্য
পাইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । নরেন্দ্র-
তনয় জয়দত্ত, বণিককুমারী হেমপ্রভাকে পাষণমুক্ত
দেখিয়া মনোরথ-মদীর পার প্রাপ্ত হইয়া শ্রেষ্ঠিকন্যার
করণগ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন । ইত্যবসরে গন্ধর্ষ-
নন্দিনী সঘ্নুখীন হইয়া অঞ্জলিবদ্ধে বিদায় প্রার্থনা করি-
লেন । জয়দত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে ? এবং
কি নিমিত্তে এত কাকূক্তি পূর্বক বিদায় চাহিতেছেন ?
গন্ধর্ষকুমারী কহিলেন, আমার পরিচয় ও শাপহত্যান্ত
বলিতেছি শ্রবণ করুন ।

বিস্ক্যাটল নামক পর্বতের শিখরদেশে ইন্দ্রহেম নামে
এক গন্ধর্ষ বাস করেন । আমি তাঁহার কন্যা, নাম তরঙ্গ-
সেনা । পিতার একমাত্র দুহিতা বিধায়, পিতা আমাকে
অতিশয় স্নেহ করিতেন । ক্ষণকালের নিমিত্তে আমাকে
দৃষ্টিপথের অন্তরা হইতে দিতেন না । অধিকন্তু, মধ্য-
াহ্নিক আহারান্তে দিবসিক নিদ্রাকালে পিতা আমাকে
লইয়া, নানা প্রকার হিতোপদেশ ঘটিত কথোপকথন
করিতে করিতে নিদ্রা যাইতেন । উক্ত সময়ে আমি
পিতার নিকটে না থাকিলে তাঁহার সুযুপ্তি হইত না ।
এক দিন আমি, বয়স্যগণের সঙ্গে খেলা করিতে করিতে
বেলা অবসানকালে পিতার নিদ্রার কথা স্মৃতিপথাক্রম
হওয়াতে, ব্যস্তসমস্তে বাটী গেলাম । পিতা, বহুক্ষণ
পর্যন্ত শয়্যাতে শয়িত থাকিয়া, নিদ্রাভাবে ক্লেশ পাইতে-

ছিলেন । আমাকে দেখিয়া সরোষবচনে অভিসম্পাত করিলেন, রে দুৰ্জ্জতে ! যেমন তুই পাষণ্ডহৃদয়-স্বকপা হইয়া, অদ্য আমাকে নিদ্রাভাবে অশেষ ক্লেশ দিলি ; তেমন পাষণ্ডাঙ্গী হইয়া গিয়া অবনীতে থাক । দারুণ শাপ শুনিয়া আমার প্রাণ কাঁপিতে লাগিল । তখন জনকের অজিযুগলে পতিতা, এবং ধূলায় ধূসরিতা হইয়া, শোকাবেগচিন্তে বহু স্তুতি বিনতি করিতে লাগিলাম ।

আমার কাকুত্তি শুনিয়া, পিতার অন্তঃকরণ হইতে রোষবিষের তিরোধান হইয়া, মেহামৃতের আবির্ভাব হইল । তখন আমাকে মৃদিকা হইতে উত্তোলন পূৰ্ব্বক ক্রোড়ে লইয়া, ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । আমিও জনকের কণ্ঠ ধারণ করিয়া, বাপ্পাকুললোচনে বিলাপ করিতে লাগিলাম । কিছুকালান্তে জনক উত্তরীয় বসনে আমার নয়নান্নু মোছাইয়া দিয়া, সান্দ্র নাবাক্যে বলিতে লাগিলেন বৎসে ! আর খেদ করিও না ! তোমার বিলাপ শুনিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া বাইতেছে ! আমি বলিলাম বিলাপ করা বৃথা ; আপনি যে শাপ দিয়াছেন, কদাচ তাহার অন্যথা হইবেক না । নিশ্চয় পামাণ হইয়া ধরাতে থাকিতে হইবে । কিন্তু ধরাবাসী মানব এবং পশু পক্ষী, আমাকে স্পর্শ করিয়া, গন্ধর্ষকুলাসহ্য পরিহাস করিবে । আমার জগদারণ করিয়া, কেবল গন্ধর্ষকুলে, সেই অসহনীয় রহস্য কলঃ প্রদান করিতে হইল । হা ! আমার ন্যায় হতভাগ্য আর এ কুলে কখনও জগদগ্রহণ করে নাই ! পিতা বলিলেন বৎসে !

তুমি সে জন্যে খেদ করিও না । তোমার সে খেদ নির-
মানে আমি এই প্রতিবিধান করিলাম ; যে তোমাকে
ধরাতে স্পর্শ করিবে ; সেই তোমারি ন্যায় পাষণ কলে-
বর প্রাপ্ত হইবে, বলিয়া পুনরায় ক্রন্দন করিতে করিতে
বলিলেন বৎসে ! যদি আর কিছু তোমার প্রার্থনিতব্য
থাকে বল ; আমি তোমার সে প্রার্থনা পূর্ণ করিতেছি ।
পিতার এতাদৃশ বাক্যে সচ্ছন্দ দয়াদ্রুতিততা জানিতে
পাইয়া, শোকার্হবচনে বলিলাম তাত ! যদি প্রসন্ন হইয়া
থাকেন, তবে এই জিজ্ঞাসা যে, এ দাসী কতদিনে শাপো-
ন্মুক্ত হইয়া, পুনরায় ভবদীয় চরণরাজীব দর্শন করিয়া
হৃদয়রাজীব উল্লাসিত করিতে পারিবে?

আমার এতাবৎ কাতরোক্তি শুনিয়া পিতার বক্ষঃস্থল
অশ্রুনারাভিষিক্ত হইল । পরে আমাকে ক্রোড়ে লইয়া
বিমান যানারোহণ পূর্বক এই বিপিনের অন্তরালে যে
এক সুস্ম্য ইন্দ্রিয়মধ্যে আদ্যা শক্তির প্রতিকূপ স্থাপিত
আছে, তথায় উপস্থিত হইয়া, সাক্ষাৎ প্রণিপাত পূর্বক
ক্লতাঞ্জলি পুটে কালজায়া মহাকালীর স্তব করিতে লাগি-
লেন । মহেশজায়া স্তবে সঙ্কট হইয়া বলিতে লাগি-
লেন বৎস ইন্দ্রহেম ! জয়ন্তী-নগরের অধীশ্বর নরনাথ
জয়েশ্বরের পুত্র জয়দত্ত, আপন জায়া হেমপ্রভার গবে-
ষণা করিতে করিতে এখানে আসিয়া, আমার চরণামৃত
তরঙ্গসেনার পাষণময় শরীরোপরি নিক্ষেপ করিলে,
তরঙ্গসেনা তখন গন্ধর্ভ কলেবর প্রাপ্ত হইবেক, বলিয়া
অন্তর্দান হইলেন ।

এদিকে ভুবনপ্রকাশক নলিনীবল্লভ সূর্য্যদেব, চরম-
গিরি আরোহণ করিলেন । বিহঙ্গমগণ আপন আপন
কূলায়ে আগমন করিয়া স্নমধুরস্বরে জগন্নিয়ন্তা জগদীশ্বরের
গুণ গান করিতে প্রবর্ত হইল । তখন, আমার শরীর
পাষণবৎ দৃঢ় হইতে লাগিল । পিতা এতাবৎ দেখিয়া,
আমাকে এখানে রাখিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বিক্ষ্যা-
চলাভিমুখে প্রতিপ্রস্থান করিলেন ।

তদবধি আমি শৈলাঙ্গী হইয়া এখানে আছি ।
তৎপরে কি হইয়াছে না হইয়াছে, তাহার কিছুই জানি
না । হে নরেন্দ্রতনয় ! অদ্য ভবদীয় শুভাগমনে আমি
সেই দারুণ অভিসম্পাত হইতে মুক্তি পাইলাম । জয়দত্ত
বলিলেন গন্ধর্কসুতে ! আমিও আপনার আত্মপুঙ্খীক
বিবরণ শুনিয়া বিস্মিত হইলাম ; এবং আমার দ্বারা
আপনি শাপোন্মুক্ত হইলেন বলিয়া চরিতার্থতা প্রাপ্ত
হইলাম ।

রাজপুত্র এবং গন্ধর্কনন্দিনী এইমতে কথোপকথন
করিতেছেন, এমন সময়ে বণিকনন্দিনী অপরিচিতের
ন্যায় রাজপুত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া গন্ধর্ক-
বালাকে বলিলেন গন্ধর্কনন্দিনী ! ইনি কে ? এবং কি নি-
মিত্তে এই ঘোর অটবীমধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন ? জয়দত্ত
বলিলেন, কএক দিনস গত হইল আমার যৌবনরাজ্যে
এক চোর প্রবেশ করিয়া, হৃদয়মন্দির হইতে মনোক্রপ
বহুমূল্য মণিহরণ করিয়া পলাইয়াছে । আমি সেই তরুর
অন্বেষণ করিতে করিতে এখানে আসিয়াছি । শুনিয়াছি

সে স্ত্রী জাতি। বণিকনন্দিনী এতদ্রূপ ব্যঙ্গোক্তি শ্রবণে গন্ধর্ষনন্দিনী সম্বোধনে ঈষদ্ভাস্যবদনে বলিলেন গন্ধর্ষ-কুমারি! এ অতি অপকৃপ বাক্য শুনিতো পাইলাম। স্ত্রী-জাতি অবলা, সহজেই দুর্মলা; চৌর্য্য কি এদের কার্য্য? পুরুষেরাই এ কার্য্যে অধিক পারদর্শী হইতে পারে। রাজ-পুত্র কহিলেন চন্দ্রাননে! তদীয় সুধাময়বাক্যে সুধাবিক্ত করিলে; ফলে এবাক্য কিসে অসম্ভব হইতে পারে? যিনি, দেবদেব মহাদেবের গর্ষ খর্ষকারী কন্দর্প রাজার ধ্বংসর অপহরণ করিয়া ভ্রুকটাক্ষে এবং তাঁহার জগদ্বি-জয়ী দামামা দুটি হরণ করিয়া অধোমুখে বক্ষে রাখি-য়াছেন; যিনি, দুর্দান্ত করিশত্রুর কটি-শোভা অপহরণ করিয়া পশুরাজকে গিরিকন্দরে তাড়াইয়া দিয়াছেন; তা-হার পক্ষে এ ক্ষুদ্র পুরুষের মণ হরণ করা, সহজ বৈ কি?

ভূপতিনন্দনের এতাদৃশ বাক্যে বণিকতনয়া লজ্জা ও হর্ষের উদ্রেক সহকারে মৌনাবলম্বন করিলেন। গন্ধর্ষ-বালা বলিলেন, আপনাদের রহস্যভঙ্গী দৃষ্টে পরম চরি-তার্থ হইলাম। আহা! এ পাপীয়সীই উভয়কে এত ক্রেশে পতনের হেতু হইয়াছিল। এইক্ষণে বাসনা যে আমি সাক্ষাৎ থাকিয়া, গান্ধর্ষবিধানে আপনাদের উপ-যম করাইয়া, অন্তঃকরণের উল্লাস লাভ করি, এই বলিয়া গন্ধর্ষনন্দিনী পুষ্পাহরণে গমন করিলেন।

গন্ধর্ষবালা গমন করিলে পর রাজকুমার বলিলেন প্রিয়ে! তুমি কি গতিকে এখানে আসিয়া পাষণ হইয়া-ছিলে? হেমপ্রভা বলিলেন নাথ! বিনাহরাত্রিতে আমি

সখীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আছি ; এমন সময়ে এক গন্ধর্ষ বিমানাবতীর্ণ হইয়া মায়াবলে আমাকে মূচ্ছিতপ্রায় করিয়া, এখানে লইয়া আসিল, এবং গন্ধর্ষসুতা তরঙ্গসেনার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, প্রাণধিকে আশ্রজে ! তুমি পাষণ্ডী হওয়াবধি আমি হেমচন্দ্র বণিকের কন্যার বিবাহদিনের প্রতীক্ষায় অতি দুঃখে কালযাপন করিতেছিলাম। অদ্য তাহার বিবাহ দিন নির্ণীত হইয়াছিল। আমি ভগবতীর আজ্ঞানুসারে তাহাকে হরণ করিয়া আনিয়া তোমাতে স্পর্শ করাইতেছি বলিয়া আমাকে, গন্ধর্ষনন্দিনী তরঙ্গসেনার অঙ্গে স্পর্শ করানমাত্র, আমার শরীর পাষণ্ড হইয়া গেল। তৎপরে আর কিছুই জানি না।

দম্পতি এইমতে কথাবার্তা করিতেছেন, এমন সময়ে গন্ধর্ষনন্দিনী বিবিধপ্রকার পুষ্প হস্তে লইয়া আসিয়া বলিলেন নৃপকুমার ! বণিককুমারি ! আপনারা উভয়ে গাত্ৰোত্থান করিয়া দমুডনাশিনী ব্রহ্মসনাতনীর মন্দিরে চলুন। তথায় বিবাহকার্য্য সমাধা করিয়া আমার মানস পূর্ণ করিতেছি। এই বলিয়া রাজকুমার ও বণিকতনয়ার হস্তধারণ করিয়া দেবীর মন্দিরে গমন করিলেন।

তিন জন সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রণাম বন্দনাদি করিলেন। গন্ধর্ষনন্দিনী দেবীকর্তৃক রাজকুমার দ্বারা পাষণ্ডমুক্ত হইয়াছেন বলিয়া রুতজ্জতারসে অভিষিক্ত হইয়া, প্রথমতঃ দেবীর নিকট বহুবিধ স্তব স্তুতি করি-

লেন। পরিশেষে গান্ধীবিধানে জয়দত্ত ও হেমপ্রভার বিবাহকার্য সমাপণ করিলেন।

বিবাহানন্তর রাজকুমার বলিলেন গান্ধীকনন্দিনি ! আপনার পিতাকর্তৃক বনিকনন্দিনী এখানে আনীত হইয়া পাষণ হইয়াছিলেন ! এখন ইনি পাষণমুক্ত হইয়াছেন । ইঁহাকে লইয়া এত দূরবস্তী স্বদেশে যাইতে অশেষবিধ ভয় হইতেছে ; কেননা নীতিজেরা কহেন “উজ্জ্বল মর্পণ ও সুন্দরী কামিনী, ইঁহারা কখনও বিবাদ বর্জিত হয় না” । সুতরাং আমি কিমতে এই অবলা বণিকবালাকে লইয়া গৃহে যাইতে পারি ; তাহার প্রতিবিধান করুন । গান্ধীকনন্দিনি, রাজপুত্রকে এক গুটিকা প্রদান করিয়া বলিলেন, এই গুটিকা, বণিকবালা হেমপ্রভা মুখে রাখিলে, তৎপ্রভাবে বিংশতি বর্ষীয় যুবা হইয়া, পথাতিক্রম করিতে পারিবেন, বলিয়া পিতৃ দর্শনের বিদ্যায় লইয়া, বিদ্যাচলে গমন করিলেন ।

রাজকুমার, গুটিকা প্রাপ্তে বাক্পথাতীত আনন্দ লাভ করিয়া সহাস্য আস্যে বণিকনন্দিনীর করগ্রহণ করিলেন, এবং গুটিকা তাঁহাকে দিলেন । হেমপ্রভা, গুটিকা মুখে ধারণ করিয়া বিংশতি বর্ষীয় যুবা হইলেন । তদনন্তর দম্পতি পরস্পরের কর গ্রহণ পূর্বক দুর্গম বস্ত্রাতিক্রম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । নানাপ্রকার বন, নগর, গিরি, কন্দর অতিক্রম করিয়া, শেষে হেমন্তপুর নগরে উপনীত হইয়া, ধনপতি হেমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন । হেমচন্দ্র, জয়দত্ত সঙ্গে তনয়া হেমপ্রভাকে পুন-

রায় প্রাপ্ত হইয়া, অতলস্পর্শ আনন্দার্ণবে মগ্ন হইলেন ।
পরে মহাসমারোহে দুহিতা হেমপ্রভাকে, জয়দত্ত সঙ্গে
বিবাহ দিয়া, মহাসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন ।

কিয়দিনান্তর, জয়দত্ত আপনালয়ে যাওয়ার অভিপ্রায়
প্রকাশ করিলেন । হেমচন্দ্র, প্রথমতঃ অসম্মত হইলেন ;
পরিশেষে জামাতা এবং দুহিতার নিতান্ত ইচ্ছা জানিয়া,
প্রচুর ধন প্রদান করিয়া, বহুসজ্জাক পদাতি সঙ্গে দিয়া,
রাজধানী জয়ন্তীনগরে পাঠাইয়া দিলেন ।

ধরণীপতি জয়েশ্বর, বহুকালান্তে পুত্র মুখ নিরীক্ষণ
করিয়া, অকুল আনন্দমাগরে পতিত হইয়া, নানাপ্রকার
আনন্দোৎসব করিতে লাগিলেন । পরিশেষে বৃদ্ধতা-
প্রযুক্ত আপনাকে রাজকাৰ্য্যের অনুপযুক্ত জ্ঞান করিয়া
কুমার জয়দত্তকে রাজত্বভার প্রদানপূর্ব্বক আপনি অব-
সর লইলেন । জয়দত্ত, রাজা হইয়া পরমসুখে দুর্ঘটদমন,
শ্রেষ্ঠপালন করিতে লাগিলেন ।